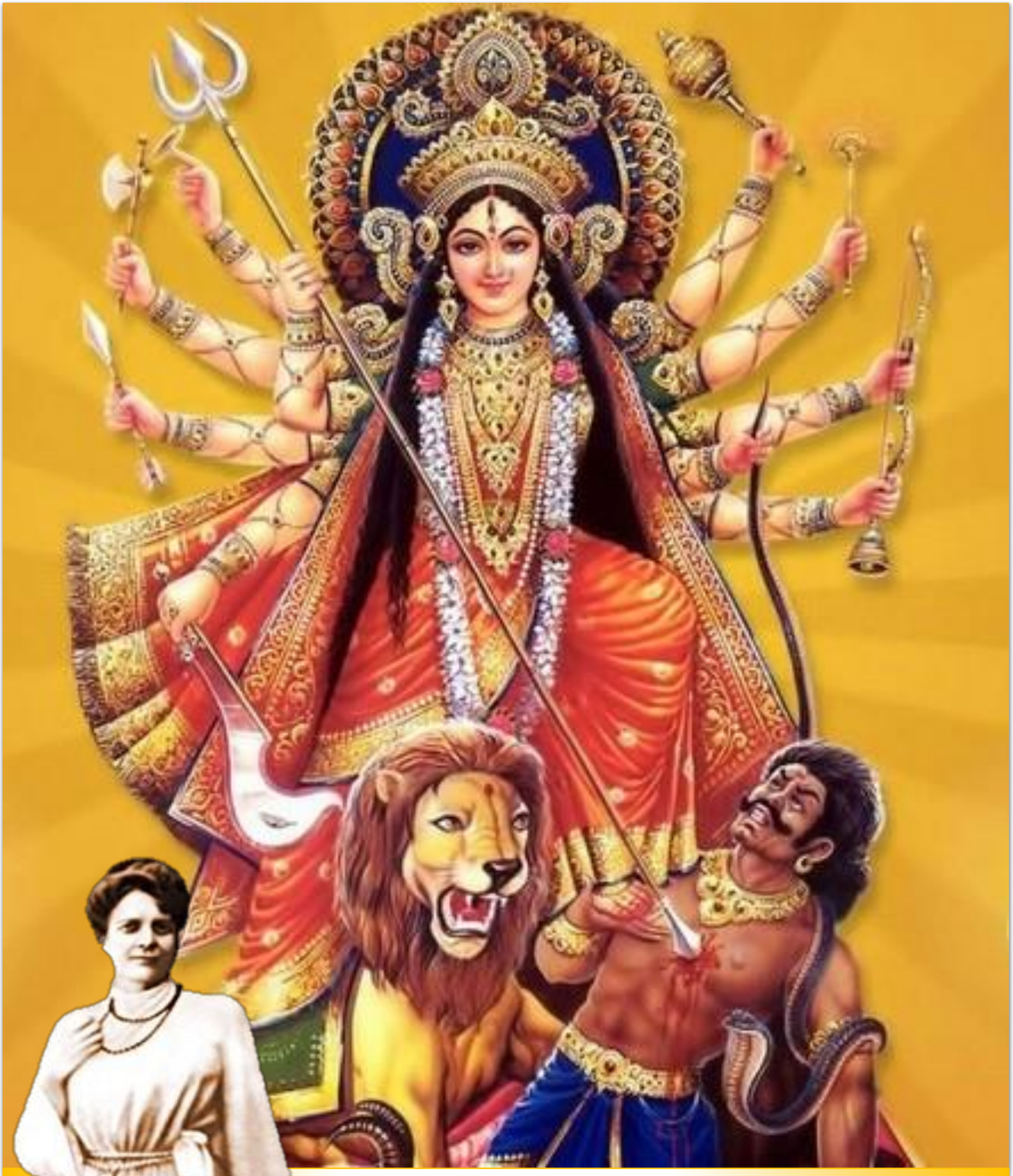

প্রবাসী শারদীয়া

১৪২৫ / ২০১৮

সবারে করি আহ্বান

অকালবোধন

রাবণ বিনাশের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বসন্ত কালে প্রচলিত দুর্গাপুজোর বদলে শরৎ কালে দুর্গাপুজো করে অকালবোধন করেছিলেন।
সঙ্কল্প পূরণ করতে ১০৮ টি পদ্ম দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

প্রবাসী কমিটির পক্ষ থেকে
শারদীয়ার পূণ্যলগ্নে
সকলকে জানাই
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

PRABASI of New England

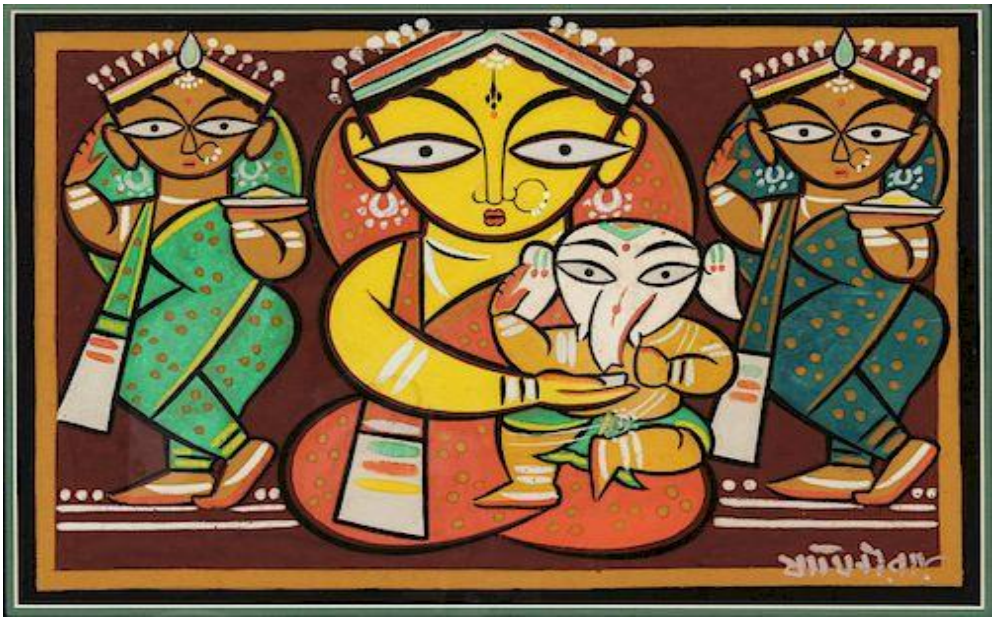

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমো নমঃ

Oh Devi, who art manifest in all beings as the Universal Mother, we bow to thee!

DURGOTSAV 2018

WELCOME

Prabasi Executive Committee 2018

President:	Ashish Brahma
Vice President:	Rathin Sinha
Treasurer:	Bibrata Deb
Secretary:	Ashok Ghosh
Member :	Sameer Chakraborty
Member:	Arindrajit Basak
Member:	Aninda Barat

Prabasi Board of Trustees 2018

Suparna Bose Indra Deb

DURGOTSAV 2018

WELCOME

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক / লেখিকা	পাতা
সম্পাদকীয়	রেখা বসু	6
পূজা - অনুষ্ঠানের ভাবার্থ	স্বামী দিব্যানন্দ	7
ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ক		
প্রবন্ধ : প্রভাতরবির কিরণমালা	প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা	12
Essay : Nivedita On Education, Science & Social Reformation	Swami Suparnananda	18
প্রবন্ধ : শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ভগিনী নিবেদিতা	স্বামী বিমালাত্মানন্দ	27
প্রবন্ধ : ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্পকলা	প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা	34
প্রবন্ধ : নিবেদিতার স্বপ্ন	প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা	40
প্রবন্ধ : স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা	পার্থ পাল	43
প্রবন্ধ : নিবেদিতা ও তাঁর স্বপ্নের স্কুলবাড়ি	শতভিষা মুখোপাধ্যায়	45
কবিতা : চাহনি	শতভিষা মুখোপাধ্যায়	48
প্রবন্ধ : নিবেদিতার শিবজ্ঞানে জীবসেবা	বিজয় কুমার বসু	49
Essay : The Summer of 1902	Sumit Nag	52
Letters : Letters of Sister Nivedita	Sister Nivedita	57
অন্যান্য		
Essay : Hinduism	Shankori Basu	62
প্রবন্ধ : ডাক্তার - রোগীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে	ডাঃ শঙ্কর নন্দী	65
Community News - Saheli	Gouri Banerjee	70
কবিতা : প্রভুর সঙ্গে মুখোমুখি	সুমিতা বসু	72
Community News - বাণীতীর্থ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্র	গোপা কুমার	73
ছবি : পাখির পালক	ঈপ্সিতা ব্যানার্জি	74
ছোট গল্প : ফুলকুসমায় এক রাত্রি	প্রভাত কুমার হাজরা	75

ছোট গল্প : জীবনের গতি বিচিত্র	সত্যপ্রিয় সরকার	80
কবিতা : সংশয়	প্রান্তিক রায়	85
Short Story Flesh (original story Mangsho)	Haimanti Dorai	86
কবিতা : আমার পুরোনো ট্রাঙ্ক	সত্যপ্রিয় সরকার	97
কবিতা : সুখ পাখি	সেলিনা আহমেদ	99
কবিতা : অণু কবিতা	বদিউজ্জামান নাসিম	100
Children's Corner		
Ma Durga in Shreya's Eye	Shreya Bose	101
Welcome Ma Durga	Radha Basu	101
A New Dawn	Vedashree Acharya	102
Zinnia	Radha Basu	103
Blanked Out	Bihan DasGupta	103
The Bird Who Wanted a Friend	Vedashree Acharyya	104
Back to School	Umasrija Sarkar	105
Ma Kali	Sourya Chaudhuri	106
In Memorium		107

সম্পাদকীয়

শারদীয়া দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। এর ভিত্তি ধর্মীয় হলেও এর উদযাপন ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন যে ম্যাগাজিন ছাড়া বাঙালির দুর্গাপুজো হয়না। পুজো হচ্ছে অথচ ম্যাগাজিন বেরোলো না এ হতেই পারে না। তাই অন্য সব বছরের মত আমরা এবছরেও পুজোর সময় শারদীয়া ম্যাগাজিন বের করলাম।

প্রবাসীর এবারকার পুজো উপলক্ষে সংগৃহীত সাহিত্য সম্ভার ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল। একসময় আমাদের দেশে সব প্রচেষ্টাকে তাদের ঋষি ও পথিকৃতদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হত। মন্ত্র ছিল -

'ইদং নমঃ সর্বেভ্যঃ ঋষিভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পথিকৃদভ্যঃ।'

নিঃসন্দেহে নিবেদিতা ভারতীয় রেনেসাঁসের অন্যতম পথিকৃৎ। যাঁদের চেষ্টায় ভারতীয় শিল্পকলায় ইউরোপীয় আর্টের অন্ধ অনুকরণকে বর্জন করে ভারতীয় রীতি ও ভাবধারা ফিরে এসেছিল নিবেদিতা তাঁদের অন্যতম। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর জন্য তাঁকে কাগজে কলমে (officially, আসলে নয়) বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল। নিবেদিতা ভারতে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের অন্যতম পথিকৃৎ। নিবেদিতা স্কুল নামে খ্যাত স্ত্রীশিক্ষায়াতনটি তার সাক্ষ্য। নিবেদিতা স্কুলই সম্ভবত ভারতে প্রথম স্ত্রীশিক্ষায়াতন যার লক্ষ্য ছিল ভারতীয় কৃষ্টি ও মূল্যবোধের শিক্ষা।

পরোক্ষভাবে হলেও ভারতীয় বিজ্ঞান অবদানে নিবেদিতার ঋণ অনস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানে যে সমস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান দেশে ও বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁদের প্রথম। নিবেদিতা তাঁকে নিরন্তর সাহায্য করেছেন। হতাশা জনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেও তাঁকে সাহায্য করেছেন।

ভারতবর্ষের সেবায় নিবেদিতার যে বহুবিধ অবদান তার অনেক বিবরণ এই পত্রিকায় নিবেদিতা বিষয়ক প্রবন্ধে আছে।

পরিশেষে, শারদীয়ার পুণ্যলগ্নে প্রবাসী শারদীয়ার সকল লেখক, পাঠক আর যাঁরা নেপথ্যে সাহায্য করেছেন এই পত্রিকা সম্পূর্ণ করতে, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মা দুর্গার আবির্ভাব সকলের অন্তরকে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায় ভরে তুলুক এই প্রার্থনা।

পূজা অনুষ্ঠানের ভাবার্থ
স্বামী দিব্যানন্দ

শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে দুর্গাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি লেখা আছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিখ্যাত স্মৃতিকার রঘুনন্দন 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার যে-সম্পূর্ণ বিধি দেন এবং ষোড়শ শতকে সেটাকে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের (যিনি বঙ্গদেশে প্রথম প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন) রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী যে-পূজাপদ্ধতি রচনা করেন তা বর্তমানে অনুসৃত হয়।

বোধন

আশ্বিন মাসের শুক্লা তিথিতে সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় চার দিন ব্যাপী দুর্গাপূজা। বোধন কথার অর্থ জাগরণ - নিদ্রিত অবস্থা থেকে উত্থান। শরৎকাল সূর্যের গতির দক্ষিণায়নের কালে পড়ে এবং প্রচলিত ধারণা, এ-সময় দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। কোনও কোনও পুরাণ ও প্রবাদ অনুযায়ী রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য এইসময় দেবী দুর্গাকে জাগরিত করে পূজা করেছিলেন দেবীর অনুগ্রহলাভের জন্য। তাই পূজার মন্ত্রে আছে "রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিত দেবী।" এই কারণে শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলেও অভিহিত করা হয়। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ - স্বামী বিবেকানন্দের কথায় প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই দেবত্ব নিহিত - আর এই তত্ত্বটি আমরা ভুলে যাই আমাদের অহংবোধের জন্য। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমাদের অন্তরের দেবত্ব নিদ্রিত থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয়। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' - দেবতা হয়ে দেবতার পূজা করবে। তাই মানুষের অন্তরের নিদ্রিত দেবত্বকে - হৃদয়মাঝে সুপ্ত জগজ্জননী মা দুর্গাকে জাগরিত করার জন্য এই বোধন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভক্ত প্রার্থনা করেন - 'জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণধারিণী।'

ঘটস্থাপন

ঘটস্থাপন যাবতীয় প্রতিমাপূজার প্রাথমিক ও আবশ্যিক অঙ্গ। এর জন্য প্রয়োজন একটি তামা, পিতল বা মাটির ঘট, মাটি, জল, আম্রপল্লব, গোটা ফল (সশিস ডাব), ফুলের মালা, সিঁদুর, নতুন বস্ত্র (গামছা) ইত্যাদি। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মাটির ওপর ঘটস্থাপন করতে হয়। ঘটে কোনও দেব বা দেবীর মূর্তি নয় - এটি ঈশ্বরের নিরাকার অবস্থার প্রতীক। অনেক সময় প্রতিমায় পূজা করা সম্ভব না হলে শুধু ঘটস্থাপন করে পূজা করা যেতে পারে। এই ঘটস্থাপনের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ,"অনন্ত সমুদ্র, জলের অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাইরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে - অন্তরে বাইরে সেই পরমাত্মা। তবে ঘটটি কী? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তর বাহিরে বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ওই 'আমিটি'

যদি যায়, তাহলে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।" বিশ্বচরাচরের সর্বত্র এক ঈশ্বরই বিরাজমান - সকল প্রাণীর অন্তরেও ঈশ্বর, বাহিরেও ঈশ্বর। কিন্তু মানুষ তার ক্ষুদ্র, সান্ত মনে অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না, তার অহংকার বা আমিত্বের জন্য। এই আমিত্ব না গেলে ঈশ্বরলাভ হয় না। - আর তার জন্যই পূজা জপধ্যান - তপস্যা - ক্ষুদ্র 'আমি'কে বৃহৎ 'আমি'তে লীন করে দেয়ার প্রয়াস। আমাদের হৃদয়ে জীবাত্মা বা ক্ষুদ্র আমিত্বের বাস কল্পনা করা হয় - যেন ঘটের মধ্যে জল। ঘটস্থাপনে ঘটে সেই হৃদয়ের প্রতীক। সেই ঘটে পরমাত্মা বা বৃহৎ 'আমি'কে আহ্বান করে পূজা-অর্চনা করা হয়। মূর্তি কোনও নির্দিষ্ট দেবতা বা দেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করা যায় কারণ ঈশ্বর সকল সর্বদেবদেবীস্বরূপ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

প্রতিমাপূজায় একটি অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। মাটি, পাথর, কাঠ বা ধাতু ইত্যাদি জড় পদার্থ দিয়ে দেবতা বা দেবীর যে-মূর্তি তৈরি হয় তা জড়, পুতুল মাত্র। তাই অনেকের ধারণা, হিন্দুধর্মে পুতুল পূজা করা হয়। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অজ্ঞানতাপ্রসূত। মাটি, কাঠ, ধাতুর মূর্তিতে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাঁকে জীবন্ত কল্পনা করে পূজা হয়। মূর্তিতে শাস্ত্র-বিহিত উপায়ে চৈতন্যময় দেবতার প্রতিষ্ঠা করাই প্রাণপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য।

নবপত্রিকা

শারদীয়া দুর্গাপূজার সপ্তমী তিথির সকালে নবপত্রিকা স্নান ও স্থাপন পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ। পত্রিকা কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র পাতা। নবপত্রিকার আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা। প্রকৃতপক্ষে পাতা নয় - নয়টি গাছের চারা - কলা, কালো কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধানের শিস। সপত্র কলাগাছের সঙ্গে বাকি আটটি উদ্ভিদের সপত্র গাছ বা গাছের ডাল একত্র করে দুটি বেলের সঙ্গে সাদা অপরাজিতার লতা ও হলুদ রঙের সুতো দিয়ে বেঁধে ঘন্টা-বাদ্য-শংখধ্বনি সহযোগে নিকটস্থ জলাশয়ে স্নান করিয়ে লালপাড় শাড়ি এমনভাবে জড়ানো হয় যে দেখতে অনেকটা ঘোমটা দেওয়া বধূর মতো লাগে। এই নবপত্রিকা গণেশের ডান পাশে স্থাপন করা হয়। প্রচলিত ভাষায় একে কলাবউ বলা হয়। অনেকে একে গণেশের স্ত্রী মনে করলেও তা আদৌ নয়। নবপত্রিকা প্রকৃতপক্ষে প্রতীক উপাসনা। নয়টি উদ্ভিদই দেবীর এক একটি প্রতীক বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী - যথা কলার ব্রাহ্মণী, কচুর কালিকা , হলুদের দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরোহিতা মানকচুর চামুন্ডা ও ধানের লক্ষ্মী। এই নবপত্রিকাপ্রবেশের মাধ্যমে, দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানের প্রথাগত সূচনা হয়। বাকি দিনগুলি নবপত্রিকা অন্যান্য দেবদেবীদের সঙ্গে পূজিত হতে থাকেন।

কুমারীপূজা

দুর্গাপূজার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কুমারীপূজা। কুমারীপূজার অর্থ জীবন্ত দেবীর পূজা। কুমারীপূজার তাৎপর্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথা থেকে স্পষ্ট: "কুমারীপূজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক-একটি রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারী তে ভগবতীর বেশি প্রকাশ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলিতে শারদীয়া

দুর্গাপূজায় মহাষ্টমী তিথির সকালে অনুষ্ঠিত কুমারীপূজা একটি বিশেষ আকর্ষণ। পূজার জন্য নির্দিষ্ট একটি সুলক্ষণা বালিকাকে স্নানান্তে নববস্ত্র, পুষ্পালঙ্কার ও নানাবিধ অলংকার এবং আলতা-সিঁদুর-চন্দনে সুসজ্জিত করে মণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমার সামনে আসনে বসিয়ে ফুল-বেলপাতা-নৈবেদ্য প্রভৃতি নানাবিধ উপাচারে মন্ত্রোচ্চারণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে কুমারীপূজা করা হয়ে থাকে। পুষ্পাঞ্জলি ও ঢাক-ঢোল-বাদ্যের সঙ্গে আরতি করে পূজা সম্পন্ন হয়। বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় স্বামীজী স্বয়ং নয়জন অল্পবয়সের কুমারীর পূজা করেন।

সন্ধিপূজা

দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথির শেষ চব্বিশ মিনিট ও মহানবমী তিথির প্রথম চব্বিশ মিনিট অর্থাৎ এই দুই তিথির সন্ধিক্ষণে মোট আটচল্লিশ মিনিটের মধ্যে দেবীর যে বিশেষ পূজা হয় তা সন্ধিপূজা বলে পরিচিত। সন্ধিপূজার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়, সন্ধির অষ্টমীভাগের পূজায় দেবীর বর্ষব্যাপী পূজার আর নবমীভাগের পূজায় দেবীর কল্পকালের পূজার তুল্য ফল লাভ হয়। এই পূজায় দেবীর চামুন্ডা - রূপের পূজা হয় ও সাধারণত একশো আটটি প্রজ্জ্বলিত দীপমালা দেবীকে নিবেদন করা হয়। দীপমালা নিবেদনের মন্ত্রে আছে: হে দেবী, সংসাররূপ অন্ধকার নাশ করবার জন্য এবং পবিত্র জ্যোতি প্রাপ্তির জন্য এই দীপমালিকা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করো। অর্থাৎ সংসারের মায়ামোহের ফলে মনে যে-অজ্ঞানতার অন্ধকার রয়েছে, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দেবী তা কৃপা করে দূর করে দিন - এই প্রার্থনা।

বলিদান

পূজায় বলিদান অতি প্রাচীন প্রথা। বৈদিক যুগে যজ্ঞে গোবৎস বা অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বলি দিয়ে সেই মাংস অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। তবে পশুবলির পরিবর্তে আখ, কলা, চালকুমড়ো বা সুপারি বলিও বিধিসম্মত। শাক্যমুনি বুদ্ধদেব যজ্ঞে পশুবলির চরম বিরোধিতা করেছিলেন। 'অহিংসা পরম ধর্ম' বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মুখ্যবাণী। বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণবধর্মে বলিদানের প্রথা নেই। মানুষের অন্তরে পাশবিক ভাবের যে প্রবণতা আছে তা বিনাশের বাহ্যিক প্রতীক এই বলিদান। তন্ত্রশাস্ত্রকারদের মতে নিজদেহের রক্ত দিয়ে পূজা করলে দেবী সহস্রগুণ তুষ্ট হন। দেবীর কাছে স্বীয় অহংকার বা আমিত্ব বলি দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলি। নিজের রক্তদান আত্মবলিদানের প্রতীক আত্মসমর্পণের স্থূল প্রতীক। নিজের রক্তের বদলে একটি নিরীহ দুর্বল পশুকে বলি দিলে দেবী কতটা তুষ্ট হয় জানা নেই। তবে কালীপূজাতেই এই বলিদানের প্রাধান্য - দুর্গাপূজাতেও কোথাও কোথাও বলিদান হয়। বারোয়ারি সার্বজনীন পূজায় পশুবলিদান দেখা যায় না। হিন্দু ধর্মের অন্য কোনও দেবতা বা দেবীর পূজায় বলিদানের প্রথা নেই।

হোম

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে যজ্ঞ বা হোম ছিল প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পূজা আর হোম সমগোত্রীয় অনুষ্ঠান - পূজায় যেমন বিবিধ অনুগ্রহ লাভের কামনায় দেবতাকে নানান উপচার যথা ফুল, বেলপাতা, নৈবেদ্য ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সম্মুখস্থ পাত্রে দেওয়া হয়, হোমেও সেইরকম বিবিধ

উপাচার অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। প্রাচীনকালে অগ্নিকে মনে করা হত দেবতার মুখ। দেবতাকে মন্ত্রসহ নিবেদিত দ্রব্য দেবতার কাছে অগ্নি পৌঁছে দেবেন এই ছিল বিশ্বাস। হোম নিবেদিত দ্রব্যকে বলে হব্য, দানপ্রক্রিয়াকে বলে আহুতি, আর হোমে প্রজ্জলনের জন্য ব্যবহৃত কাঠকে বলে সমিধ। হোম চলাকালীন অগ্নি নিরবিচ্ছিন্ন প্রজ্জলিত রাখাই বিধি। তার জন্য প্রয়োজন ইন্ধন। এক্ষেত্রে ঘৃতকে ইন্ধনরূপে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নিশক্তির বাহ্যিক প্রকাশ। তাই অগ্নিতে সমর্পণ করা মানে মহাশক্তিকেই প্রত্যক্ষভাবে অর্পণ করা। যে-দেবতা বা দেবীর উদ্দেশে হোম অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নামে নামকরণ করা হয়। দুর্গাপূজায় যে হোম হয় তাকে বলা হয় সপ্তশতী হোম।

বিসর্জন

সাময়িক প্রতিমাপূজার শেষ অঙ্গ বিসর্জন। সকল প্রাণীরই মৃতদেহ বিনষ্ট হয়। পৃথিবীর মাটি-জল-হাওয়াতেই মিশে যায়। ঠিক তেমনি যে-প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আবাহন করা হল - পূজার শেষে সেই ঈশ্বরকে আবার পূজকের হৃদয়ে পুনঃস্থাপন করাই বিসর্জন। তবে যেখানে দেবী বা দেবতার নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বিসর্জন হয় না। পূজার বিধি অনুযায়ী সংহারমুদ্রায় একটি ফুল নিয়ে আঘ্রাণ করে কল্পনা করতে হয়, প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তি পূজকের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। অর্থাৎ সাকার রূপে যে ঈশ্বর বাইরে পূজিত হলেন, তাঁর সাকার রূপ বিসর্জিত হলো এবং তিনি নিরাকাররূপে অন্তরে ফিরে এলেন।

পূজাবিধি অনুযায়ী বিসর্জনের পর বাহ্যিক নিষ্প্রাণ মৃন্ময়ী মূর্তিকে বাদ্য-ঘন্টা-শোভাযাত্রা সহকারে জলে নিমজ্জন করা হয়। প্রকৃতির নিয়মে জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য। সংসারে অতিথিকে সাদরে আহ্বান করি, আবার ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় জানাই।

ঠিক তেমনি শারদীয়া দুর্গাপূজায় চারদিন মহাসমারোহে পূজা-আনন্দ-উৎসবের পর বিসর্জনের বিদায়বেলাটি বড়ই বিষাদের। তাই মায়ের কাছে আবদার - 'পুনরাগমনায় চ' - 'আবার এসো মা।' একটি বছর হৃদয়ে থেকে বৎসরান্তে জগন্মাতা বাহ্যিক প্রতিমার রূপে আবার আসবেন সন্তানের পূজা গ্রহণ করতে - এই কামনা। "মাটির প্রতিমা গলে যায় জলে, বিজয়ায় ভেসে যায়, / আকাশ-বাতাসে মার স্নেহ জাগে অতন্দ্রকরুণায়।"

পূর্বে প্রকাশিত : নিবোধত - ৩০ বর্ষ - ৩য় সংখ্যা - সেপ্টেম্বর - ২০১৬ (সারাংশ)

Sister Nivedita

1867 - 1911

প্রভাতরবির কিরণমালা

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

একটি তেরো বছরের ছোট বালিকা, নৌ-নীলরঙের পোশাক গায়ে, ছোট্ট তিন বছরের ভাইকে নিয়ে একা চলেছে জাহাজপথে। দাদামশাইয়ের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ভাইটিকে। মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অবুঝ ভাইকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে চলেছে 'জননীর প্রতিনিধি অতি ছোট দিদি'। ফ্লিটউড থেকে যেতে হবে আয়ারল্যান্ড। সদ্য স্বামীহারা মা দারিদ্রের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে চলেছেন। নিজের কাজের ফাঁকে ছোট শিশুটিকে দেখাশোনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোলের ছেলেটিকে পাঠাচ্ছেন আয়ারল্যান্ডে , নিজের বাবার কাছে। তিনি দৌহিত্রের দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু ছেলেকে পৌঁছে দেওয়ার সময় কোথায়? কাজ ফেলে কীভাবে যাবেন মা? এগিয়ে এলেন বড় মার্গারেট। হলই বা তেরো বছর বয়স তার, সাহস এবং আত্মনির্ভরতায় , দরদে এবং হৃদয়বত্তায় মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ছোটবেলা থেকেই স্বতন্ত্র, অনন্য। ঊষার রক্তিমরাগ মধ্যাহ্নের দিনমণির প্রখর কিরণের সূচনা করে। মার্গারেট তথা নিবেদিতার শৈশব জুড়েও ছড়িয়ে আছে এমনই কত ঘটনা যা তাঁর বৃহত্তর, বিশ্বব্যাপী জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

মার্গারেটের ঠাকুরদা জন নোবল এবং ঠাকুরমা এলিজাবেথ নিলাস। যখন তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তখন জনের বয়স চল্লিশ এবং এলিজাবেথের আঠারো। জন পাদরি ছিলেন। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মৃত্যু হয়। সে সময় এলিজাবেথের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। তিনি পরে রাজনীতির একজন বড় কর্মী হয়ে ওঠেন। তাঁর বাড়ি ছিল রাজনৈতিক আলোচনা ও সমাবেশের কেন্দ্র। সেই পরিবেশেই মানুষ হন

মার্গারেটের পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল। এক ধনী কাকার প্রচেষ্টায় স্যামুয়েল কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু আদর্শবাদ, রাজনীতি, জনসেবা ও বাগ্মিতা ছিল তাঁর রক্তে। ব্যবসায়িক বৈষয়িকতা তাঁকে তৃপ্তি দিত না। এই ব্যবসায়ী সমাজেরই এক সমাবেশে তিনি মেরি ইসাবেল হামিল্টনকে দেখেন। তখন তাঁদের বয়স অল্প। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরে সুন্দর শহর ডানগ্যাননে তাঁরা সুখে বসবাসও করতে থাকেন। এখানেই তাঁদের প্রথম কন্যা মার্গারেটের জন্ম ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর।

স্যামুয়েলের অতৃপ্তি তাঁর তরুণী বধূর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। ইসাবেল অনুভব করেন যে তাঁর কবি, বাগ্মী এবং আদর্শবাদী স্বামীর জন্য ব্যবসা উপযুক্ত পেশা নয়। তাই অনেক ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন ইংল্যান্ডে। সেখানে স্যামুয়েল ব্যবসা বিক্রির টাকা দিয়ে খুব অল্প খরচে ম্যাঞ্চেস্টারে পড়াশুনো আরম্ভ করলেন। আর তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর স্বপ্নপূরণের কথা ভেবে অনভ্যস্ত অপরিসীম কষ্টসাধ্য জীবন কাটাতে লাগলেন। সে - সময় একবছরের ছোট মার্গারেটকে তাঁরা রেখে এসেছিলেন ঠাকুরমা এলিজাবেথের কাছে। কিছুদিন পরে একটু গুছিয়ে নিয়ে যখন তাঁরা কন্যাকে আবার ফিরে চান তখন বৃদ্ধা নিজের নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে শিশুটিকে নিজের

কাছে রাখতে চাইলেন। স্যামুয়েল ও ইসাবেল তাতে আপত্তি করেননি। ফলে মার্গারেট তার শৈশবের প্রথম চারটি বছর কাটিয়েছিল ডানগ্যাননে, তার ঠাকুরমার কাছে। সেখানকার স্নিগ্ধ প্রকৃতি, ঠাকুরমার অনলস কর্ম ও ভগবৎ উপাসনা - সবকিছু মার্গারেটের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মার্গারেটের জীবনে এলিজাবেথ নিলাসের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর।

শিশু মার্গারেট যখন ফিরে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে তার অপরিচিত মনে হতে থাকে। পিঠোপিঠি বোন নিম তো প্রথমে তাকে হিংসে করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু ছোট্ট মার্গারেটের ব্যবহার ছিল বড় সুন্দর। বড় দিদির মতো একটু কর্তৃত্ব করত ঠিকই কিন্তু একইসঙ্গে তার ব্যবহারে স্বার্থপরতার চিহ্ন ছিল না। তার ছোট বোন স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে নিজের সুখের দিকে তার নজরই ছিল না। সেই অল্পবয়সে আশ্চর্য ক্ষমাশীল ছিল তার মন। বাবার উপাসনা সভায় যেসব অসুস্থ, বৃদ্ধ মানুষ আসতেন তাঁরা মার্গারেটের এই করুণাপূর্ণ মনের জন্য তাকে খুব ভালোবাসতেন। শিশু মার্গারেটও নিয়মিত তাঁদের দুঃখকষ্টের খবর নিত।

মার্গারেট একটা নিঃসঙ্গ শৈশব কাটিয়ে এসেছে বলে নতুন পরিবেশে এসেও খেলাধুলার চেয়ে পড়াশোনায় বেশি ডুবে থাকতে চাইতো, কিন্তু তবু বোনেদের সঙ্গে সে নানারকম শিশুসুলভ খেলাধুলাতেও মেতে যেত মাঝে মাঝে। স্যামুয়েলকে দরিদ্র অঞ্চল ওল্ডহ্যামে পাঠানো হয়েছিল ধর্মযাজক হিসাবে। সেখানে বাড়ির বিরাট রান্নাঘর আর মস্ত চিমনি ঘিরে মার্গারেট খেলত তার বোনেদের সঙ্গে। ফায়ারপ্লেসের দুধারে মা আর দাসী বসে সেলাই করতেন কারণ চোখবাঁধা শিশুরা কানামাছি খেলতে খেলতে যদি আগুনের কাছে চলে যেত তাহলে তাদের আটকাতেন মা। তারপর গুটিসুটি শিশুরা বাবা-মায়ের কাছ ঘেঁষে শুয়ে পড়ত, শুয়ে শুয়ে শুনতো কত গল্প। বাবা কিংবা মায়ের কাছে শোনা সেসব কাহিনি মার্গারেটের চেতনার বিকাশে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। অন্ধকারে আলো জ্বালার পয়সা সবসময় থাকত না, তাই মা অন্ধকারে মেয়েদের গল্প শোনাতেন। এত জীবন্ত ছিল সেসব বর্ণনা, বাইবেলের কাহিনিকে এমনভাবে অভিনয় করে দেখাতেন তিনি, ইজিপ্টের জ্বালাযন্ত্রণা বা আয়ারল্যান্ডের নবজাগরণের কাহিনিগুলো এত স্পষ্ট হয়ে উঠত তাঁর গল্প বলার দক্ষতায় যে শিশুরা শিহরিত হতো, তাদের মনে রং ধরে যেত। মার্গারেটের মধ্যেও ছিল গল্প বলার এই কুশলতা। ওই শিশুকালেই বোনেরা রূপকথার গল্প শোনার আগ্রহে তাকে ছাড়তেই চাইত না। তারা খেলত চার্চের মধ্যেও। মার্গারেট নিত প্যাস্টরের ভূমিকা। সে বেদি থেকে বক্তৃতা করত আর নিম ও অ্যানি মন দিয়ে সেই বক্তৃতা শুনত। চার্চে তারা বাইবেলের নানা মজার অংশ অভিনয় করত। যেমন, ইজরায়েলের রাজা একচল্লিশ বছর তার প্রভুর সেবা করলেও তার পায়ে খুব ঘা ছিল অথবা ইসাকিয়েল ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু গোমড়া মুখে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে। ভগবান যে আনন্দময়, তাঁর সঙ্গে কথা যে গোমড়া মুখে বলা যায় না, তা ওই শিশুরা বুঝে গিয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে। রবিবার চার্চে যাওয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল বাইবেলের গল্প। বিকেলে উপাসনার পরিবর্তে তারা মায়ের কোলে মুখ ডুবিয়ে ধর্মকাহিনির গল্প শুনত। এসব গল্পকথা মার্গারেটের মধ্যে গড়ে তোলে মিশরের প্রতি ভালবাসা। ভবিষ্যতে মিশর ও তার

শিল্পের প্রতি মার্গারেটের যে প্রীতি দেখা যায় তার সূচনা এই সময়েই। তার মনে প্রাচ্যের প্রতি কৌতূহলের সূত্রপাতও হয় মায়ের মুখে শোনা এইসব গল্পগুলিকে কেন্দ্র করে।

ওল্ডহ্যামে থাকার সময় মার্গারেট ও তার ছোট বোনকে প্রথম স্কুলে পাঠানো হয়। তাদের ঠান্ডা রাখার জন্য সেন্ট জনের চোদ্দটি অধ্যায় মুখস্থ করতে দেওয়া হয়েছিল। স্কুলে তাদের দুই বোনের ডাক নাম দেওয়া হয়েছিল 'সান' ও 'রেন'। নিশ্চয়ই মাগারেটের নাম ছিল সূর্য, কারণ শিশুকাল থেকেই তার দীপ্তিই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এরকমই কোনো এক সময়ে ছোট বোন অ্যানি মারা যায় বনের বিষফল খেয়ে। ওল্ডহ্যাম শহরটা ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থকর, দরিদ্র। বেশি গাছপালা ছিল না। প্রধানত শ্রমিকদের বসতি ছিল। জনসেবার প্রেরণায় মার্গারেটের বাবা প্রথমে তাঁর ওল্ডহ্যামে বসবাসকে মেনে নিলেও চার বছরের মধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নাই। তিনি মারণব্যাধি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেন। তাঁকে পাঠানো হল সুন্দর, স্বাস্থ্যকর গ্রাম গ্রেট টরিংটনে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাত্র একবছর বেঁচে রইলেন তিনি। বাবার সঙ্গে মার্গারেটের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। বাবা গভীর বিবেচনার সঙ্গে তার স্বতন্ত্র, গভীর মনটিকে বুঝতে চাইতেন। কন্যার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। বাবার কাছে মার্গারেট যেমন আইরিশ রাজনীতির কথা শুনত, তেমনই শুনত ভারতের কথা। সে সব আলোচনা সেই বালিকা বয়সেই তার চোখ
ভারতের স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিল। সে ভাবত বড় হলে সে ভারতে যাবে, সেবাকে আদর্শ হিসাবে নেবে। ছোট মনের এই অসংগঠিত কল্পনার উৎস ছিলেন তার পিতা। বাবার বইগুলো সে গুছিয়ে রাখত, বাবাকে জোরে জোরে বাইবেল পড়ে শোনাত অনেক ছোটবেলা থেকেই। গ্রামের অসুস্থ মানুষেরা বাইবেল শুনতে চাইলে চার বছরের ছোট্ট মার্গারেট তাদের রোগশয্যার পাশে বসে অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে বাইবেল পড়তো। করুণায় ভরা নিষ্পাপ শিশুর মুখে স্পষ্ট উচ্চারণে সেই ধর্ম পাঠ সকলকে অভিভূত করে দিত। বাবাকেও নিয়মিতভাবে একই আনন্দ দিয়ে গিয়েছিল মার্গারেট। কিন্তু দশ বছর বয়সে পিতৃহারা হতে হয়। পিতৃবিয়োগের আঘাত মার্গারেটের শিশুমনে খুব গভীরভাবে বেজেছিল। পিতার মৃত্যুর পর শুরু হলো বালিকা মার্গারেটের জীবনের তৃতীয় পর্ব।

তিনটি শিশু পুত্রকন্যাকে নিয়ে ইসাবেল যখন দিশেহারা তখন তাদের পরিবারকে সাহায্য করতে শুরু করলেন ইসাবেলের বাবা হ্যামিলটন। ইসাবেলও নিজের অন্নসংস্থানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। আর এই সময় বাধ্য হয়ে দশ বছর ও আট বছরের দুটি কন্যা - মার্গারেট ও মে - কে বোর্ডিং হাউসে পাঠিয়ে দিতে হল। কোলের ছেলেটির বয়স তখন মাত্র তিন মাস। মার্গারেট ও মে লন্ডনে একটি চার্চ-বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হল। স্কুলের নাম হ্যালিফ্যাক্স কলেজ । স্কুলটি কংগ্রিসন্যালিস্ট চার্চের কয়েকজন সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। কিন্তু মার্গারেটের মতো প্রখর বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানপিপাসু বালিকার পক্ষে স্কুলটি নিতান্তই সাদামাটা। তার চিন্তার সার্বিক খোরাক জোগানোর ক্ষমতা স্কুলটির একদমই ছিল না। ফলে পরবর্তী সাতটি বছরের স্কুলজীবনের খুব একটা স্মৃতি হয়তো তার ছিল না। মার্গারেটের ছোট বোন লিখেছেন, মার্গারেটকে হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে পাঠানো মস্ত ভুল হয়েছিল। সে খুব পড়তে ভালোবাসত কিন্তু স্কুলে একটাও লাইব্রেরি ছিল না। সে ভালোবাসত

ইতিহাস পড়তে। ভালোবাসত কবিতা, শেক্সপিয়ার, মিলটন। কিন্তু স্কুল তার সেই মনের খোরাকের যোগান দিতে পারতো না। ছুটিতে বাড়ি এলে দাদামশাই তাকে বই উপহার দিতেন। মার্গারেটের ছোট ভাই রিচমন্ড বলেছেন, মার্গারেট শেক্সপিয়ারের নাটকীয় বক্তৃতার আবৃত্তি করতে ভালোবাসত। তার স্পষ্ট মনে আছে যে দিদির ম্যাকবেথ থেকে আবৃত্তি কী হৃদয়গ্রাহী হত।

"Is this a dagger which I see before me The Handle toward my hand?"

অথবা রিচমন্ডের মনে আছে দিদি জুলিয়াস সিজার থেকে এন্টোনির বিখ্যাত ভাষণ আবৃত্তি করত। আর সে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকত।

"Friends, Romans, Countrymen, lend me your years!"

রিচমন্ডের জীবনে মার্গারেটের প্রভাব বিপুল। সে মনে করে যে তার মনোবিকাশে দিদির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি ছিল। প্রথম জীবনে দাদামশাই তাকে বাইবেল পড়তে উৎসাহ দিতেন আর মার্গারেট উৎসাহ দিত শেক্সপিয়ারের নাটক পড়তে। মার্গারেট তার স্বল্প পুঁজি দিয়ে ভাইটিকে শেক্সপিয়ারের নাটক দেখতে পাঠিয়েছিল, কিন্তু কোনও অভিনেতা - অভিনেত্রীর পাঠ বা অভিনয় রিচমন্ডের মনে ধরেনি। হোন না তারা পেশাদার, তার দিদির পাঠ ছিল সবার সেরা। কেউই মার্গারেটের মতো তীব্র শক্তিতে শেক্সপিয়ারের লাইনগুলি বলতে পারত না। এই অভিমত কিন্তু দিদির সম্বন্ধে ছোট ভাইয়ের অতিরঞ্জন নয়। সত্যিই মার্গারেটের ছিল আশ্চর্য প্রতিভা। কোনও ভাবের সঙ্গে তন্ময় হয়ে গিয়ে সে যখন তাকে ভাষায় ফুটিয়ে তুলত, তখন তার প্রকাশে এতটুকুও কৃত্রিমতা থাকত না। সেই জীবন্ত আবেদন যে কোনও পেশাদার অভিনেতার অভিনয় - ক্ষমতাকে ছাপিয়ে যেত।

এমন যে মার্গারেট, সে বিদ্যালয়ে মনের মতো বই পেত না, মনের মতো সঙ্গীও পেত না। সে চেষ্টা করত সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, তাদের মতো হয়ে উঠতে, কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শবাদী মনোভাব কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়াত। একটি ছোট বালিকার পক্ষে দিনের পর দিন এই মানসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া এত সোজা নয়। নিজের পছন্দের মতো পরিবেশ নেই, মনের খোরাক নেই, সর্বোপরি বালিকার কাছে তার বাবা নেই, মা নেই যাঁদেরকে এই অসুবিধার কথা সে খুলে বলতে পারে। কেবল আছে ছোট বোনটি, কিন্তু সে তো নেহাতই শিশু। মার্গারেট প্রতিমুহূর্তে অনুভব করত সে নিঃসঙ্গ। কিন্তু যে - অপরিসীম মনোবলে গতানুগতিকের সঙ্গে এক না হয়ে গিয়ে মার্গারেট তার নিঃসঙ্গতাকে ধরে রাখতে পেরেছিল সেই মানসিকতাকেই ভবিষ্যৎ 'নিবেদিতা' নির্মাণের প্রধান শক্তি ছিল। তীক্ষ্ণধী মার্গারেট অবশ্যই ক্রমেই অধ্যয়নের মধ্যে আনন্দের স্বাদ পেতে শুরু করেছিল এবং শিক্ষিকাদের সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তার এই ভালো লাগা ক্রমে গভীর অনুরাগে পরিণত হয়। আগুন তো কখনও চাপা থাকে না, তাই ক্রমশঃ মার্গারেটের উদারতা, নির্ভীকতা, পবিত্রতা ও আদর্শবাদ তাকে স্কুলের নেত্রী করে তোলে। তার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ মনোভাবের জন্য তাকে নেতা বলে মেনে নিতে অসুবিধা হয় না সহপাঠিনীদের। তার প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য বিদ্যালয়ে সে যে সবসময় খুব জনপ্রিয় ছিল তা নয়, কিন্তু তার সততার এমনই জোর যে তাকে অগ্রাহ্যও করত না কেউ। বিদ্যালয়ে মার্গারেট প্রচুর লেখালেখি করত। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে

পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ছিল তার পছন্দের বিষয়। সাহিত্যের সঙ্গে সংগীত ও কলাবিদ্যাতেও তার আগ্রহ জন্মায়। সে সকলকে নিয়ে বক্তৃতা করত আর গল্প বলে মাতিয়ে রাখতে পারত। ভূতের গল্প, বাইবেলের গল্প-কাহিনির অভাব হত না তার। নতুন নতুন গল্প বানিয়েও ফেলত। এই সৃজনশীলতাই উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করে তাকে এত বড়মাপের লেখিকা ও শিল্পীতে পরিণত করেছিল।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে এলেন একজন প্রধান শিক্ষিকা। মার্গারেটের জীবন গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রীদের মধ্যে কঠোর ধর্মজীবন যাপনের আগ্রহ জাগিয়ে দিতে। তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রীদের মধ্য থেকে একটি উৎসাহী দলও গড়ে উঠেছিল। মার্গারেট সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হল। তাদের গভীরভাবে বাইবেল চর্চা করতে হত এবং তারা সারা জীবনের জন্য কঠোর সংযম ও আত্মশাসনের ব্রত ধারণ করেছিল। বাস্তবে অবশ্য এই ছোট মেয়েরা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে নানারকম প্রলোভনের আকর্ষণ এড়াতে পারত না, কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল মার্গারেট। সে বরাবর তার আনুগত্য ও সংকল্পে অবিচল ছিল। এজন্য কতসময় বন্ধুদের বিদ্রূপের শিকার হতে হত তাকে। 'উদ্ভট', 'গুরুমণি' - এরকম নানাধরণের ব্যঙ্গ তাকে বিঁধে যেত। কিন্তু ভবিষ্যতে যাকে পদে পদে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় ঠেলে চলতে হবে, সমালোচনার ঝড় মাথা পেতে নিতে হবে, সেই নিবেদিতার মানসিক ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল জীবনের শুরুতেই; আর শুরু থেকে শেষ - প্রতিবারই তিনি প্রতি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন।

কঠিন জীবনের শপথ নিলেও কাঠিন্য কখনও মার্গারেটের চরিত্রকে নীরস করেনি। তার ছিল সহজাত সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ। স্কুল যদিও ক্যাথলিক ভাবের বিরোধী ছিল কিন্তু কেবল শিল্পপ্রীতির আকর্ষণে মার্গারেট ক্যাথলিক ভাবের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতো। ক্যাথলিক ভাবের প্রেরণায় সে প্রাচীন শিল্প ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির অনুশীলনও শুরু করেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সৌন্দর্য, শিল্প হৃদয়বত্তার সন্ধানী ছিল মার্গারেট। তাই ক্রমে যাজকীয় কঠোরতার উর্ধে এক উন্মুক্ত, সহৃদয় ধর্মের ছবি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় তার চেতনায়।

মার্গারেট সত্যসন্ধানী। সে সত্য, শিব ও সুন্দরকে নিয়ে চলে। উদার তার ঈশ্বরপ্রেমী মন, সেজন্য কোনও সংকীর্ণ নিয়মের গন্ডিতে বাঁধা পড়েনি। সেসব ও কৈশোরের সীমানা ছাড়িয়ে মার্গারেট যেমন এগিয়ে চলেছিল বৃহত্তর জীবনের দিকে, তার শিক্ষকজীবন, সাহিত্যিক জীবন যেমন তাকে নিশ্চিত সাফল্যের দিকে নিয়ে চলেছিল, ঠিক তেমনই তার মানসিক প্রসারতা ও বেড়েই চলে, বেড়ে চলে তার সত্যানুসন্ধিৎসা। সত্যকে জানার আকুতি তো কখনও ব্যর্থ হয় না, তাই মার্গারেট সত্যের সঙ্গে কোনও আপসের পথে গেল না, শুধু অপেক্ষায় রইল।

মার্গারেটের এই বিকাশ, এই পূর্ণতার আর্তি অবশেষে যাঁর প্রসন্ন আঁখিপাতে ধন্য হয়েছিল তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। শিশু থেকে তরুণী হয়ে ওঠা মার্গারেটের সমগ্র জীবন জুড়ে কোনও ছন্দপতন নেই। একটিই সুর যেন ক্রমে ক্রমে অলংকৃত হয়ে অপরূপ একটি রাগিণীর জন্ম নিয়েছে। ভারতের প্রাণ - বীণায় সুর তুলেছিলেন যে - বিবেকানন্দ, তিনিই সুনিপুণ কৌশলে অতি সুচারুভাবে এই

রাগিণীটি ভারতের বুকে বাজিয়েছিলেন। আর ভারতবাসী সেই সুরের ধারায় অভিস্নাত হয়েছে, পবিত্র হয়েছে।

পূর্বে প্রকাশিত : নিবোধত - ৩১ বর্ষ - ৫ম সংখ্যা - জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী ২০১৮

উদ্ধৃতি

"যদি আমরা আর কিছুই শিখতে নাও পারি, আমরা যেন বিলিয়ে দিতে, সেবা করতে ও ত্যাগ করতে শিক্ষা করি। আমরা যেন আমাদের অন্তর থেকে 'দোকানদারির' শেষ রেশটুকুও নির্মূল করতে পারি। আত্মানুশীলনের জন্য নয়, পরন্তু আদর্শের জন্যই আমাদের ভালো-মন্দ সব নিয়ে যেন আমাদের সর্বস্ব নিবেদন করতে পারি। প্রেমের জন্যই প্রেম, কর্মের জন্যই কর্ম, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শের এই-ই হলো শ্রেষ্ঠ বার্তা।"

ভগিনী নিবেদিতা

"মানুষের মতন আচরণ করো। তোমার ভিতর যে-শক্তি কাজ করছে তাকে বাইরে প্রকাশ করো। নিজের ওপর আস্থা রাখো। করণ যে চায়, সে পায়; যে খোঁজে, সে আবিষ্কার করে; যে দরজায় ঘা দেয়, তার কাছে দরজা খুলে যায়। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সমগ্র অতীত নিহিত আছে। যে কোনও মুহূর্তে আমার ভিতর দিয়ে সে-পরম জ্যোতি প্রকাশ পেতে পারে।"

ভগিনী নিবেদিতা

"প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের গোটা চরিত্র প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি কাজ আমাদের হয় বলিষ্ঠ, নয় দুর্বলতর করে - আর আমাদের নিজেদের চরম প্রকৃত মূল্যকে বাড়ায় বা কমায়। আধ্যাত্মিকতার উদয় আচমকা হয় না। উত্তমরূপে কাটা পাথরখণ্ড দিয়ে বহুকাল ধরে যত্ন করে তৈরি মন্দিরেই সর্বজনীন ও শাশ্বত সত্যের প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেখানে সমস্ত ব্যাপারে সত্যের অন্বেষণ হয়েছে সেখানেই, সেই আত্মাতেই পরম সত্যের প্রদীপটি জ্বেলে দেওয়া যায়। জীবনের প্রতি কাজে সদসৎ বিচার থেকেই সেই চরম বিবেক তৈরি হয় আর সেটাই হচ্ছে শাশ্বত আনন্দ।"

ভগিনী নিবেদিতা

Nivedita on Education, Science and Social Reformations

Swami Suparnananda

Abstract : 'Sister Nivedita of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda' had a startlingly original idea about education. Of course, she had it from her Guru that education is the manifestation of the perfection already in man plus the deep faith in the undying spirit behind the national heritage. She wanted a kind of education that would enable students to know the Self and the country and develop love for the nation. There is no way of becoming selfish on the part of a student. Similarly, science education would have a purpose to unearth the mystery of truth behind creation and explore the truth which is oneness of existence and unity in diversity. She knew from her Guru that Prof. Jagadish Chandra Basu could do that and he did and she helped him at her Master's bidding. At last, the concept of Social Reformation got a new meaning in the hands of the Sister when she learnt from Swamiji that the real reformation in man has always been to transform the crude man into the great man and then the great man into the divine man. This follows the process of gradual transformation of consciousness in man. It is like making the crude oil into refined oil through oil refinery. Both secular and spiritual education do that. All the so-called reformation measures have been skin deep. What was needed was a root and branch transformation thereby bringing forth the knowledge of Atman or the spirit from the ordinary man. It is this spirit which alone abides and not matter.

Swami Vivekananda was like a thunderbolt in the hands of Sri Ramakrishna as Sister Nivedita was in the hands of Swami Vivekananda. Ramakrishna made use of his 'Vajra' to do his work. Swami Vivekananda too had his 'Vajra' to do what he could not do all by himself. The thunderbolt is a weapon in the hands of Indra, the King of gods. A selfless person is a veritable thunderbolt and as the Puranic episode has it the great sage Dadhichi gave up his body for the good of the gods who were thrown out of their heavenly kingdom by Vritrasura, the demon. This Demon could not be killed by any weapon. He was destined to be killed only by the weapon made of the spine of a great Yogi. Dadhichi was that very Yogi. As he

gave up his body, Indra took out the spine and made the thunderbolt, the all powerful weapon. Sister Nivedita heard this beautiful story of great sacrifice from Swamiji time and again. Nivedita, too, in modern times became that very Vajra, the infallible weapon, to be used by Swami Vivekananda. Swamiji prepared Nivedita to bear his torch and traditions and Nivedita, on her part, would, with unfailing devotion and attention listen to the unending flow of interpretations of the deepest secrets of the Indian philosophy. The Sister herself said, 'I am struck … by the wonder as to how such a harvest of thought and experience could possibly have been garnered or how, when ingathered could have come such energy of impulse for its giving-forth'. Further, the Swami made her live the 'orthodox Hindu Brahmin Brahmacharini's life of hardships and struggle. He directed her to accept India as she is and said that clearly: 'India is idolatrous, one must help her as she is. Those who have left her can do nothing for her'. Swamiji was very particular about preparing the ground for his disciple's spiritual growth for he had strong conviction that unless one was spiritual, one could not contribute any substantial service to humanity. He taught her, 'Serene indifference to fame and wealth proved only that a worker was spiritually the monk, though he might be playing the part of citizen and householder.' He taught her also to reconcile between the old and the new. The Sister learnt from her Guru how, 'to rationalize the modern and modernize the old. 'Nivedita received the greatest teaching from her Guru: Those who see Oneness in all the changing manifoldness of this universe alone see the truth, none else, none else. And to realize this truth there is not a single approach. One can approach it through Jnana, Bhakti, Karma and meditation. Moreover, one can reach the highest truth, through music, art and science as well. Swamiji says, 'Music is the highest art and to those who understand is the highest worship'. Anything that purifies our mind is conducive to spiritual growth. Music lovers' experience goes beyond their senses. Everybody could be a seeker of truth, not merely the mendicants. This explains why Sister Nivedita plunged into work for the development of Indian society in all the fields like Art, religion, education, science and social reformations. Sister Nivedita specially remembers her Guru's message, 'Art, Science and Religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita'. She loved India because India and Swami Vivekananda were never separate. Swamiji was India, India's good was Sister's major concern. Her India must grow in both secular and spiritual education. India must rearrange her society sufficiently to hasten the process of the flourishing of Advaita. She, therefore, worked hard to inspire people belonging to diverse ways of life like poets, artists, scientists, Sadhakas, patriots and monks. We shall dwell on the areas of education, science and social reformation.

Education

When we look upon education as being based on knowledge we tacitly accept that this knowledge is both secular and spiritual. Secular knowledge expresses itself through the study of physical universe like Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Geography, History, language, medicine, Engineering, IT, technology and the like. It deals with the physical universe including our body. But we have to know ourselves as Spirit, the most sacred aspect of our being. It is not enough to study the properties of matter alone. We must know the properties of man as well. What makes a man a man? What qualities should he possess so that he can be called a man? In education, this question, the most vital question, remains unanswered. We know others; we do not know ourselves. We are actually Spirit beyond body, mind and intellect. Like her Master Nivedita speaks of this total education as eloquently as possible. But she had some other things to offer when she expressed her views on the aim of education for both men and women to Rabindranath Tagore when he requested her to teach his daughter. She was against following the European method of education in teaching the Indian girls. Indian boys and girls would combine the personal potentials with the national spirit and heritage. They must be made to feel proud of their great heritage. They shall attend classes for six months and see the country for the remaining six months of an academic year. We note with wonder that even Rabindranath Tagore was so impressed that he sent his only son Rathindranath, a twelve-year old student, to Kedarnath with Swami Sadananda (Swamiji's disciple) and others at the behest of Sister Nivedita.

Tagore sent his teenager son on this risky journey or pilgrimage because he relied on the integrity of the monks of the Ramakrishna Mission. Rathindranath recounted later, 'When father heard that one of the monks from Belur Math, Sadananda Swami, was going to lead one such group to the shrine of Kedarnath in the Western Himalayas he made up his mind to send me along with them'. Nivedita herself took Rathindranath along when she visited Buddha Gaya with Prof. Jagadish Chandra Bose and others. The idea is that every student must intensely know and love India since, (i) it is the birth place of the highest and best of all religions, (ii) it has the greatest mountains, the Himalyayas. (iii) it is the country where the houses are simple, where domestic happiness is most to be found and where the women ungrudgingly, unselfishly and unobtrusively serve the dear ones from early morn to dewy eve.

Fineness of Character is the goal of education

According to the Sister, the motherland is a vast university and every child born within her sphere is a student. India has to absorb 'new truths with old conservatism' on the one hand and every child must help to build up the inheritance for the future, on the other. Every student must accept infinite debt to the famous names of the past, to the crowds of the 'Unknown Dead'. Each will know that the driving-force is both character and the mind of humanity. So, cultivation of fine character is a must and it is nothing but acquiring nobility of tastes. The path is not easy; there must be no laziness. The task of the teachers is to infuse the loftier ideals into the minds of pupils.

Modern education for women: Women must mould their lives from the great characters of the scriptures like Gargi, Maitreyi, Sita, Savitri and the like. 'Truth must be carried from the mythological into the scientific setting' The doctrine of the divinity of the human soul is true of both man and woman, high or low, learned or ignorant, Christians or Hindus, virtuous or vicious. The Sister had observed that our womanhood was shrinking. She said, 'If Sita and Savitri are ever to be born of Indian mothers, we must create new types for them, suited to the requirements of the modern age. Gandhari must live again, with new names to think of with all the ancient faith and courage, steadfastness and sacrifice. Damayanti must live and Draupadi too'. 'Awake! Awake! The greatness of Indian womanhood must be the cry of Indian men'. The Sister has retold those stories to suit the modern need in the book, 'The Cradle Tales of Hinduism'. Also, she believes 'the nation constitutes a church and each act of public and domestic life a sacrament. They must learn art, needle work, besides acquiring the geographical knowledge. There shall be a great synthesis of the craft-women of both Hindu and Mohammedan communities.

Method of Education

She had developed her own way to impart practical education where she gave the details of (a) object lessons, (b) teaching geography (c) teaching history. Readers may see her articles on History on Practical Education. The purpose of education is training the mind. Obviously, then, the nature of the mind becomes more important to us than any specific and special subject that has to be taught'. Hence the principles of educational psychology have to be identified. It is absolutely needed for a 'science of education'. These principles cannot be

changed and they are as fixed as those of any other science. That is to say, as science has some fixed laws, education has a science in it and the laws of education comprising science of education are also fixed and abiding. It means that nobody has the right to change them off and on and frustrate the very basis of education. The Sister has discovered that the most effective of them lies outside the class-room. 'Even an ignorant mother has an in-born gift of an ideal method.'14 She can, in a better way, stimulate the child to teach himself. It is because we wrongly accept that telling is teaching. No, never. 'Words do not convey knowledge. Education and information are not the same thing. Knowledge comes from experience. It could be correctly infused through right training, coupled with right 'will'. Words of command fail to do the job. 'A real teacher only follows the 'lead given him by the mind and nature of the child'.

The Sister got her school inaugurated and blessed by the Holy Mother Sarada Devi in the presence of Swami Vivekananda and his brother disciples on the Kalipuja Day of 1898, and made her experiment of the idea of women's education along the nationalistic spirit of India. The Sister placed before our women the examples of greatest women of ancient India and also the ennobling life of Sri Sarada Devi, her Perennial Shelter —'Dhruva Mandir'. The Mother Sarada Devi radiated the divine glory all around out of Her corporeal body. That very school now known as Sister Nivedita Girls' School at Bagbazar, Kolkata and run by the Sarada Math, has been doing excellently in creating Gargis, Maitreyis, Sitas and Savitris in modern era.

The Sister has made some important observations in her article on The Educational Problem in India. There she said, 'In India the educational problem is the problem of problems.' According to her, the educational institutions must be based on the life of a nation. It shall be along the ends and aims of a nation as it was in old times and 'must not be an indigestible fragment'. She cited the example of the Fergusson College in Poona being the finest of the educational institutions in Western India. She observed, 'See what the Mahrattas have done… They have the strength and gift of manhood. Cannot the Bengalees and Beharees do what the Mahrattas can do?' She then reminded us of our wrong concept of Dharma: 'Your Dharma is not the secret of Mukti but is the secret of conquering the world'. If the educated people are divorced from the national life they cannot contribute, in any way, to the nation.

Like Swmiji she exhorted, 'You can, well, take Japan as your ideal for the present. In Japan, any boy can get the University Education … for a sum of 12 yens (Rs.18 only) a year. He pays no more and he has yet the run of all libraries and laboratories. He pays no fine for any breakage of instruments. There is no

penal system in Japan'. The Sister detected our weakness in politics. We are troubled more with politics. She chastised, 'Sanitation and water supply are entirely matters of indifference with you. Your public spirit is nowhere when educational problems are to be grappled with. You must awaken to activity'.
She also warned, 'Your ladies must be educated but the education of boys will be in a national sense; that of your girls must be in civic sense…

Your women are the finest ones in the world; they are not fools as you think them to be. You have a heritage in the goodness of your women'.

She continued, 'I am horrified at the immense prestige of a husband's position. You want the women of your country to be so many Savitries but you must be Satyavans for them to follow. Your life is an isolated life of intellectual luxury.' She lamented the absence of intellectual labour among the educated. 'It is an insult to womanhood when you call upon her to do the physical work for you and do not call upon her to help you in your intellectual work.' But she cheered us when she said that she had hopes, however black the moment may be. To the educated people her advice is, 'You must work with the idea of a united nationality. Look upon your country as a world, look upon it as a unity.' Therefore, education must bestow upon us the knowledge of the world, of the country and above all of the Self.

Science

Sister Nivedita was asked by Swamiji to help the great scientist, Sri Jagadish Chandra Bose. The reason was clear. Bose was engaged in proving the oneness of existence scientifically in his laboratory through his own apparatus. The Sister met him and immediately understood the genius that Professor Bose was. She ultimately collected $40,000 in two installments in those days from Mrs. Sara Bull, the Steady Mother from USA who was a Disciple of Swamiji, for setting up the research institute now known as Basu Vijnan Mandir in Calcutta (Temple of Science). She fought for Bose's recognition both abroad and at home, for ensuring congenial working hours in the College and for the restoration of parity in remuneration with his European colleagues. She helped him publish the books on his inventions, she reviewed his books and in fact, protected him under her benign motherly shelter. We may recall she breathed her last on the lap of Prof. Bose in Darjeeling only at the age of 44 years. It is Sister Nivedita who made an exciting review and study of the seminal contribution of Prof. Bose to science and Vedanta alike. According to Sister: Prof. Bose first proved that the distinction between organic and inorganic is a misnomer. There is no difference. He first proved that there is life in a creeper, then he proved that even the pot itself which

grows the creeper is also a living being. Even a piece of metal, a piece of wood, a book and a human hair—all are alive. He proved all these by making use of the English Physicist Maxwell's theoretical findings that light was a kind of electric vibration. Hertz in Germany produced electric waves by rapid electric vibration. Prof. Bose invented an apparatus which served to detect and measure the invisible light sweeping through space with incredible swiftness in its mighty billows, that wireless messages are sent. He proved that metals are capable of Death. How? He stated first that an animal is living as long as it is capable of dying. Then, it is true that death can be hastened by poison. Can the metals be poisoned? He said: Yes! He did that : He took a piece of metal and it was poisoned by making it pass through an electric spasm and at once the signs of its activity grew feebler, till it became rigid. A dose of antidote was next applied; substance began slowly to revive and after a while gave its normal response once more'.25 Thus Prof. Bose proved the all-pervading-unity of the universe and exclaimed, 'I understand for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago. They who see but one in all the clanging manifoldness of this universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.'26 He was proud that 'in metals and plants, as in animal tissues, he could show the phenomena of weariness and depression, together with the possibility of recovery, of exaltation, of irresponsiveness which is death.'

Hence the warning he gave to the would-be-scientist: 'Science can grow only where the mind of the student is prepared to recognize an underlying unity among apparently diverse phenomena'. This invention also proves that there is a Conscious Being who sits within, 'striking the molecules this way and that. He (God) alone interprets the records of strain, using the brain as His galvanometer and discarding alike the laboratory and its instruments when these no longer please Him.' He proved all this before the galaxy of the scientists at the Royal Institution, London on May 10, 1897.

Incidentally, Prof. Bose also constructed an artificial retina for the eyes and proved why we have two eyes. When we look at any object, the two eyes do not at any given instant, see equally well but each takes up the work of seeing and resting alternately. One falls asleep while the other is waking to its maximum consciousness and then vice versa. He thus made 'a paradoxical statement that under certain circumstances we can see much better with the eyes closed than with them open.' Thus through the study of physical sciences the Vedantic conclusions about the Absolute Truth or Reality could also be reached —an achievement that pleased Swamiji the most.

Also, Nivedita was proud to remember Swamiji's instruction to Jamshedji Tata for starting Research Institutes on Science and Technology in India and also the

development of Industry in our country. Nivedita writes, “We are not aware if any project at once so opportune and so far-reaching in its beneficent effect was ever mooted in India, as that of the Post-graduate Research University of Mr. Tata. It has tremendous importance in that it would make India live and perform as nation.” It would let the highest of Modern Science penetrate every pore of industry, agriculture and commerce. Tata’s scheme is a surest sign of regeneration of India by upholding the vision of modern

Social Reformations

Nivedita, like her Master, wanted root and branch transformation and not reformation as such. Nivedita recounted Swami’s words: ‘We Indians are Man-worshipers. Our God is man.’ Yes, a daily worship of the feet of beggars, after bathing and before the meal, would be a wonderful practical training of heart and hand together’. So many social organizations like Brahma Samaj, Arya Samaj, Theosophical Society were engaged in the reformation of our society. They wanted to reform man by removing evil Samskaras. Swamiji was against it. If man is divine, how dare you rectify a god? Swamiji thus rebuked his disciples. He instead insisted that the true reformers were the spiritual teachers like Buddha, Krishna, Chaitanya and so on. They did not speak against any methods people adopt; they created new men out of the old.

More than that, Nivedita saw the Holy Mother from a very close quarter. Nivedita saw India in and through the eyes of the great Sarada Mataji. The Mother did not want to reform anybody. She did not ask even Amjad, the dacoit, to give up dacoity. She arranged food for his hungry stomach. She was Annapurna, the giver of food, herself as it were. That made every difficult situation so easy for Her! Therefore, before creating social movements for the eradication of social evils, Nevedita, too, did approach and address these issues with her empathic heart. She boldly proclaimed: “India, you have no apology to make. India, your national customs require no apology. Stand by them; be large, generous and devoted. You are a mighty people; your culture, civilization are all of highest order providing solutions to the universal problems of all civilizations”.

We shall mention Swaiji’s assertions on the necessity of the study of the Upanisads which Nivedita recorded. ‘I disagree with all those’, he (Swamiji) said, ‘who are giving their superstitions back to my people. My hope is to see again the strong points of that India reinforced by the strong points of this age only in a natural way. The new state of things must be a growth from within; so preach only the Upanisads. Yes, Swamiji too taught Nivedita to preach only the Vedas, Upanisads because they speak of only this one idea, strength. We have to be strong to renounce and also face resistance. The weak have to suffer from

thousand superstitions. Instead of bothering about them, they need to be served with food, education, medicine, and true knowledge. The old ideal monasticism centers round Renunciation and Mukti. Swami has brought about a real change by inserting the new monastic ideal of Renunciation and Service in which both monks and householders take part joyfully to have mukti for oneself as well as for others simultaneously.

In conclusion, we reiterate that the three areas of service, namely, in education, science and social reformations which Nivedita sincerely rendered are not mutually exclusive. They all merge in the region of confluence and we call it consciousness. The goal of education is this knowledge of the Self; that of science is the discovery of the inter-connectedness of everything that exists in Nature outside and within. The process of such transformation lies not in reformations or doing some repair work here and there but helping man in exploring his limitless treasure within and without through proper education of total Nature – both external (Macrocosm) and internal (Microcosm) . This brings about the closeness between secular and sacred— between science and religion. Sister Nivedita quotes about it extensively from Swamiji in her book, The Master As I Saw Him, “The materialist is right. There is but One. Only he calls that One ‘matter’ and I call it ‘God’! … At first, the goal is far off, outside Nature and far beyond it, attracting us all towards it. This has to be brought near, yet without being degraded or degenerated, until when it has come closer and closer, the God of Heaven becomes the God in Nature till the God in Nature becomes the God who is Nature and the God who is Nature becomes the God within this temple of the body, and the God dwelling in the temple of the body becomes the temple itself, becomes the Soul of man. Thus it reaches the last words it can teach. He whom the sages have sought in all these places, is in our own hearts. Thou out He, O Man! Thou art He!

The Vajra emblem – The Thunderbolt
—designed by Sister Nivedita

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা সমিতির অন্যতম সদস্য

।।১।।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সক্রিয় নেতা। প্রায় চোদ্দ বছর (১৮৭৯-১৮৯২) ইংল্যান্ডের বর্ণময় জীবন পরিত্যাগ করে বরোদার রাজ কলেজে শিক্ষকতা গ্রহণ - প্রথমে অধ্যাপক পরে সহাধ্যক্ষ পদে। এখানেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা অর্জন, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয়, যোগের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। তেরো বছর (১৮৯৩-১৯০৬) পর বরোদার চাকরি ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় আসেন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রকাশ্য রাজনীতিতে যোগদান করেন।

যদিও আন্দোলনের মানস-লালনের উৎস বরোদা। ওখানে নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ১৯০২ সালে।

কলকাতায় শ্রীঅরবিন্দের স্বাধীনতা মানস আন্দোলনের স্থিতিকাল কম বেশি মাত্র চার বছরের (১৯০৬ - ১৯১০)। বিপিনচন্দ্র পালের 'বন্দে মাতরম', নিজ প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি 'কর্মযোগিন' (১৯শে জুন, ১৯০৯) ও বাংলা 'ধর্ম' (২৩শে অগাস্ট, ১৯০৯) পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের লেখনী স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল। মানিকতলায় বোমা মামলায় তাঁর আলিপুর জেলে বন্দী অবস্থায় শ্রীভগবানের নির্দেশে যোগী হওয়ার সঙ্কল্প নেন। সবকিছু হেলায় পরিত্যাগ করে চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরিতে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষ যোগী শ্রীঅরবিন্দতে রূপান্তরিত হলেন।

১৮৯৫ সালের নভেম্বরে ভগিনী নিবেদিতার জীবনের এক ধর্মসংকট অবস্থায় - সময়ে লন্ডনে ব্যক্তিত্বময় ও আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত চরিত্রবান স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাতে তাঁর সংশয়মুক্ত জীবন আরম্ভ হয়েছিল। সাক্ষাৎ থেকে পরিচয়, পরিচয় থেকে স্বামীজীর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া, পরিশেষে স্বামীজীর চরণতলে আত্মসমর্পণ এবং ভারতের জন্য মন-প্রাণ সমর্পণ - এইভাবে নিবেদিতার জীবন দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে তাঁর জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ। অবশেষে আবাল্য স্মৃতিজড়িত আয়ারল্যান্ড-লন্ডন খড়-কুটোর মতো পরিত্যাগ করে ভারততীর্থে আগমন গির্জার ধর্মযাজক কন্যা মার্গারেট নোবেলের। সময় ছিল ১৮৯৮ সালের ২৮শে জানুয়ারী। রামকৃষ্ণ - পরিমণ্ডলে পরম সমাদৃতা নোবেলের নিবেদিতায় উত্তরণ হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম সংস্পর্শে এসে। সেই সঙ্গে সঙ্ঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীর অকুন্ঠ অজস্র আশীর্বাদে পারিজাত হয়ে নিবেদিতা হয়েছিলেন তাঁর 'আদরের খুকি'। পরিচিত হলেন রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলে 'নরেনের মেয়ে' বলে। স্থিতু হলেন প্রথমে ১৬, পরে ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর ১৬ নম্বর বাড়িতে সূচনা হলো নারীশিক্ষার এক নতুন ইতিহাস - শ্রীমা

সারদাদেবীর ও স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের উপস্থিতিতে। সেই ইতিহাস বালবিধবা, নারী, বালিকাদের ভারতীয় সংস্কৃতিধারার বালিকা বিদ্যালয় - বর্তমানে বাগবাজারে 'সিস্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়' রূপে শিক্ষাজগতে সুপরিচিত। ওই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তিনি ভারতমাতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, ভারতকে নিজের স্বদেশ বলে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশী হয়েও ভারতকে ইংরেজশাসনমুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বস্তরে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নিবেদিতা। ভারত তাঁর কাছে ছিল 'উপাস্য দেবতা', 'জননী'। 'নবযুগাচার্য ' ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করে সারা ভারতে যুবকদের মনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন নিবেদিতা। এজন্য তিনি ১৯০২ সাল থেকে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সফর করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারত একদিন বিশ্বে মহান দেশরূপে বিবেচিত হবে - ধর্মে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পকলায় নতুন অভ্যুদয় হবে। তিনি ছিলেন সর্বক্ষেত্রে পরম প্রেরণাদাত্রী।

।।২।।

শ্রীঅরবিন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা উভয় ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ সমর্থক। শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরোপুরি জড়িত ছিলেন। বরোদা থেকেও তাঁর যোগাযোগ ছিল সর্বভা রতীয় রাজনীতিবিদ ও বিপ্লবীদের সঙ্গে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বরোদায় ছিলেন অন্যতম উৎসাহদাতা ও নেতা। 'কর্মযোগিন', 'ধর্ম' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। ইংরেজশাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহ করার যথেষ্ট বারুদ ভরা থাকত তাঁর প্রবন্ধে। জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। শেষে রাজদ্রোহী রূপে অরবিন্দের স্থান হয়েছিল আলিপুর জেলে।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযো াগ ছিল চরমপন্থী ও নরমপন্থী নেতাদের। বিপ্লবীদের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল সহানুভূতি। বিপ্লবের সব গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রশ্নের অতীত। বিপ্লবের বই তিনি পড়তে দিতেন বিপ্লবীদের। তবে তিনি ছিলেন গুপ্ত ডাকাতি ও হত্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বনামে ও বেনামে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতেন ইংরেজদের 'স্টেটসম্যান' ও রামানন্দ চট্টোপাধ্য ায়ের 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। তিনি কিন্তু বিপ্লববাদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি, বিপ্লববাদের প্রতি ছিল তাঁর সমর্থন। তাঁর ব্রত ছিল 'নেশন মেকিং'।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয়। তারপর গভীর সম্বন্ধ গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে, যেমন নিবেদিতার সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ ছিল বিপ্লবী নেতা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক কবি, বৈজ্ঞানিক প্রমুখের সঙ্গে। তাঁরা সবাই বাগবাজারে নিবেদিতার আবাসস্থলে আসতেন। শ্রীঅরবিন্দ আসতেন বাগবাজারে নিবেদিতার সাক্ষাৎ করতে। নিবেদিতাও যেতেন তাঁদের কাছে।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্বন্ধ নিয়ে কাল্পনিক ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বহু প্রবন্ধ এবং বইও রচিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা রচিত 'ভগিনী

নিবেদিতা' এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'নিবেদিতা লোকমাতা' পুস্তকে। এই দুটি বইতে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে নিবেদিতার ব্যাক্তিগত ডায়েরী ও চিঠিপত্র থেকে। পন্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক প্রকাশিত Sri Aurobindo on Himself and on the Mother (1953) পুস্তকেও শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তবে তা শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা নয়। প্রকাশিত প্রবন্ধ ও পুস্তকের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যেরা শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করতেন, আর তিনি উত্তর দিতেন। তাঁর উত্তরের ভিত্তিতে এই পুস্তক রচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ-সব পুস্তক থেকে আমরা শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতার সম্পর্ক এবং শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতাকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন তার আলোচনা করব ।

।।৩।।

নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। "আমি মনে করতে পারছি না যে তিনি (নিবেদিতা) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিনা (বরোদাতে)। হয়তো তিনি রাজ-অতিথিরূপে সেখানে ছিলেন। কাশীরাও ও আমি স্টেশনে গিয়েছিলাম তাঁকে আনতে, আমি মনে করতে পারছি না যে, নিবেদিতা আমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে কিছু বলেছিলেন কিনা। আমরা রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলেছিলাম। স্টেশন থেকে শহরে আসার পথে কলেজের উঁচু গম্বুজের সৌন্দর্যহীনতার নিন্দা এবং পাশেই ধর্মশালার প্রশংসা করেছিলেন। এতে কাশীরাও অবাক হয়ে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঐকালে আমি তাঁর (নিবেদিতার)) 'কালী দি মাদার' বইটি পড়ে মোহিত। আমি ওই নিয়ে কথা বলেছিলাম। তিনি শুনেছিলেন যে আমি শক্তি-উপাসক, আমি তাঁরই মতো গুপ্তবিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। বরোদার মহারাজের সাক্ষাৎকার কালে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি মহারাজকে গুপ্ত বিপ্লবে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। এজন্য তিনি মহারাজকে বলেছিলেন যে, তিনি আমার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। সায়াজিরাও অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন, এরূপ মারাত্মক কাজে অংশগ্রহন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি (মহারাজ) এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলেননি। শ্রীঅরবিন্দের এই বর্ণনা ১৯৪৫ সালের নভেম্বরের।

উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে দুটি তথ্য পাওয়া যায়।

(১) শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতা সম্পর্কে জানতেন এবং নিবেদিতাও শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে যথেষ্ট জানতেন।

(২) উভয়েই রাজনীতি ও বিপ্লববাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে নিবেদিতার ডায়েরি অনুযায়ী মহারাজা গায়কোয়াড় নিবেদিতাকে বরোদায় আসতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। বরোদায় নিবেদিতা ২১ থেকে ২৩শে অক্টোবর পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে বরোদায় নিবেদিতার বক্তৃতার কথা উল্লেখ আছে। নিবেদিতা শুনেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী। শুধু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় -- "ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল একেবারে রাজনীতির। এই সময়ে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়।" এরপর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক গভীর হয়েছিল। তবে এ সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার যোগাযোগ অতি অল্পকালের। শ্রীঅরবিন্দের কলকাতায়

অবস্থান প্রায় চার বছরের একটু বেশি। তার মধ্যে ছিল আবার শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতা-সফর ও কারাগারে বন্দিজীবন। নিবেদিতা কিন্তু কলকাতার বাগবাজারে ছিলেন মাত্র বাইশ মাস। তবুও এরই মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার যে মূল্যায়ন করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য ও তাৎপর্য আছে। কারণ, দুজনেই সমকালীন ইতিহাসে বহু-চর্চিত ব্যক্তি। দুজনেই ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় এসে বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলিকে একত্র করে একটি কমিটির অধীনে থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করা অধিকতর সমীচীন মনে করলেন। এরপর শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়। "আমি চেষ্টা করেছিলাম সেগুলিকে (বিপ্লবী গোষ্ঠী) নিয়ে একটি সংগঠন করতে । ব্যারিস্টার পি. মিত্র হবেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হলো পাঁচজনকে নিয়ে। নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।" শ্রীঅরবিন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনে নিবেদিতার ওপর ভরসা করতেন - এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণিত।

অবশ্য এই কেন্দ্রীয় পরিষদের ভাবনা ফলপ্রসূ হয়নি, শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় অবস্থানকালেই এই পরিষদ ভেঙ্গে যায়। এই প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন। "এই কেন্দ্রীয় পরিষদ দীর্ঘদিন কাজ করেনি, বাংলার প্রাথমিক বিপ্লবচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।" আমরা একটু আগেই দেখেছি, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগে থেকেই নিবেদিতা গুপ্ত বিপ্লবের সমর্থক। তিনি আরও বলেছেন, "তাঁর সঙ্গে আমার সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে গোপন বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেই। আমি আমার কাজ নিয়ে থাকতাম, তিনি তাঁর কাজ নিয়ে, বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সুপরামর্শ করার বা একত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি।"

তবে শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তি তাঁর কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "এরপর (বরোদা-ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত) আমার সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি, যতদিন না আমি জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বাংলায় স্থায়ীভাবে আস্তানা গড়ি ও বন্দে মাতরমের প্রধান সম্পাদকীয় লেখক হই।" তিনি এও বলেছেন, "পরবর্তীকালে আমি সময় বের করে নিতাম এবং বাগবাজারে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেতাম।"

শ্রীঅরিবিন্দের উপরি-উক্ত কথাগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে কী ধরনের কথাবার্তা হতো তা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। দুজনের কেউ তা কোথাও লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিবেদিতার বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতামত উল্লেখ করেছেন। "বিপ্লবী নেতাদের তিনি (নিবেদিতা) ছিলেন অন্যতম। লোকের সংস্পর্শে আসবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। খোলাখুলি সরল প্রকৃতির মানুষ, বিপ্লবের কথা সকলকে বলতেন, কোনো ঢাকাঢুকি ছিল না তাঁর মধ্যে (এটা আংশিক সত্য মাত্র)। যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মার খাঁটি স্বরূপ বেরিয়ে আসত। তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হতো। যোগ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল কাজ যেন এটা। একেই বলে

আগুন। তাঁর "কালী দি মাদার" উদ্দীপনাপূর্ণ বই, তেমনি বিদ্রোহমূলক, অহিংস নয়। রাজপুতানায় ঠাকুরদের কাছে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতেন।"

ভারতীয় রাজনীতিতে গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬ - ১৯১৫) সুপরিচিত নাম। ১৯০৫ সালে তিনি তরুণতম সভাপতি। "ধর্মীয় ধারণায় তিনি সংস্কারক দলের নেতা মহাদেব গোবিন্দ রানাডের অনুগামী - রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাতেও। গান্ধীজী গোখলেকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বলেছেন।" এই গোখলের সঙ্গে নিবেদিতার গভীর পরিচয় ছিল । আবার দুজনের মধ্যে মতের মিলও হতো না । তবুও তাঁরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন ও মানিয়ে চলতেন। বেনারস কংগ্রেসের (১৯০৫) পরও দেড় বছরের অধিক সময় নিবেদিতা গোখলের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন, যা বিস্মিত করেছিল শ্রীঅরবিন্দকে -"নিবেদিতার একটা ব্যবহার আমার কাছে অবোধ্য ছিল - গোখলেকে তিনি খুব সমীহ করতেন। কোনো বিপ্লবীর পক্ষে গোখলেকে শ্রদ্ধা করা আমার ধারণার অতীত। গোখলে ছিল, যাকে বলে as tepid as warm water. একবার গোখলের জীবনসংশয়াবস্থায় নিবেদিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, 'মিঃ ঘোষ আপনার দলের ছেলে কি এই কাণ্ড করেছে?' আমি বললাম, 'না'। তখন স্বস্তির নিস্বাস ফেলে বললেন ,'তাহলে কোনো free lancer হবে'। শ্রীঅরবিন্দের নিবেদিতার এই মূল্যায়ন বলে দেয় যে , দেশের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতা কিভাবে চরম-নরম পন্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতেন।

মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক তখন হননি। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। সে-সময়ে তিনি কলকাতায় নিবেদিতার সাক্ষাৎ পান। নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের (১৯০২ সালের গোড়ার দিকে) বর্ণনা গান্ধীজি দিয়েছেন অনেক পরে (১৯২৭ সালে)। "তারপর আমি ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থানের সন্ধান করে, তাঁর সঙ্গে চৌরঙ্গীর প্রাসাদোপম এক বাড়িতে সাক্ষাৎ করলাম"। তাঁর চারপাশের জাঁকজমকের চেহারা দেখে আমি হতভম্ব। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেও বেশি কিছু ঐক্যের ক্ষেত্র ছিল না। সে সম্বন্ধে গোখলেকে জানালে তিনি বললেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, নিবেদিতার মতো অস্থিরচিত্ত (volatile) নারীর সঙ্গে একমত হওয়ার কোনো অবকাশ থাকতেই পারে না"। নিবেদি তা সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলের 'volatile' শব্দটির প্রতিবাদ করেন 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৭ সালের মে সংখ্যাতে। একই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'বেদান্ত কেশরী' (জুন, ১৯২৭) এবং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বাংলা মাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (শ্রাবন,১৩৩৩)। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দও অত্যান্ত বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন, "নিবেদিতা Volatile। এটা বাজে কথা। তিনি একেবারে খাঁটি কর্মী।"

।।৪।।

শ্রীঅরবিন্দের ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন। "হাঁ, আমি আমার ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর (নিবেদিতার) বাগবাজারের বাড়িতে একাধিকবার গিয়েছি। আমার অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ।" এই ঘনিষ্ঠতার ফলে নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে উপলব্ধি ও প্রকাশের গৌরব

দিয়েছেন। “অরবিন্দ ঘোষ একমাত্র ভারতীয় মনস্বী পুরুষ যিনি জাতীয়তাবাদকে সৃষ্টিশীল চরিত্রে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।" শ্রীঅরবিন্দ যখন তার 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম ' পত্রিকা য় স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর গরম গরম লেখা লিখছেন, তখন ইংরেজ সরকার কর্তৃক তাঁর গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা দেখা দিল । নিবেদিতা তা জানতেন। তাই নিবেদিতা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার এড়াতে। নিবেদিতা কিন্তু 'অরবিন্দ নামক ব্যক্তিবিশেষকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেননি, তিনি চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবী-নেতা শ্রীঅরবিন্দের জন্য। তিনি মনে করতেন - এই বিপ্লবী নেতা জেলের বাইরে থাকলে স্বাধীনতা আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা চিরতরে ত্যাগ করে প্রথমে ফরাসী - অধিকৃত চন্দননগরে, পরে পন্ডিচেরিতে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে 'যোগী শ্রীঅরবিন্দ’ নামে ভারত বিখ্যাত হয়েছিলেন। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দের চলে যাওয়ায় কি ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে অনেক পত্র পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের সমসাময়িক বহু বিপ্লবী লিখেছেন, যা পন্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃপক্ষ মেনে নেননি। এ বিষয়ে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' এবং অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'লোকমাতা নিবেদিতা' বইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমরা তা নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজে কী বলেছেন, তা দেখব। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু স্বীকার করেছিলেন যে, নিবেদিতা তাঁকে গ্রেপ্তারের কথা আগেই জানিয়েছিলেন এবং গোপনে ব্রিটিশ-ভারত ত্যাগ করে অন্য স্থানে গিয়ে কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথা মূল উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "In case of these visits she informed me that the government had decided to deport me and she wanted me to go into secrecy or to leave British India and act from outside so as to avoid interruption of my work.” শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছিলেন। "তাঁর (নিবেদিতার) নিজের কোনো বিপদের প্রশ্ন নেই। তাঁর রাজনৈতিক ধারণা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ছিল, তাঁর গ্রেপ্তারের কোনো প্রশ্নই ছিল না। আমি তাঁকে বললাম যে, আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করি না। কর্মযোগিনে আমি খোলা চিঠি লিখব। আমার মনে হয়, এতে সরকার বিব্রত হবে। তাই করা হয়েছি ল। পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম, তখন তিনি বললেন যে আমার কথাই ঠিক, গ্রেপ্তা রের প্রস্তাব বন্ধ হলো। চন্দননগরে যাওয়া পরে ঘটেছিলো। এই দুই ঘটনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গ্রেপ্তারের কথা 'কর্মযোগিন' - এরই এক কর্মীর কাছে জানতে পেরেছিলেন। নিবেদিতা জানতেন না যে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে যাওয়া 'দৈবাদেশ'। "(যাওয়ার আগে) অফিস থেকে আমি নিবেদিতার কাছে কাউকে পাঠিয়ে জানালাম এবং অনুরোধ করলাম আমার অনুপস্থিতিতে 'কর্মযোগিন' সম্পাদনা করতে। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনিই পুরোপুরি চালাতেন।" শ্রীঅরবিন্দ এই বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলি থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার ওপর ভরসা ও বিশ্বাস করতেন। নিবেদিতা দক্ষতার সঙ্গে 'কর্মযোগিন' চালিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের যে আশঙ্কা করেছিলেন তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

।।৫।।

১৯৩৬ সালের ১৬ই জানুয়ারীতে শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার প্রশস্তি গেয়েছেন। "আমি নিবেদিতাকে খুব ভালো জানি (তিনি বহু বছর আমার বন্ধু এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার সাথী) এবং সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম।"

এই দুজন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ শিষ্যা। দুজনেই ছিলেন খাঁটি পাশ্চাত্যবাসী এবং হিন্দুদের মতো মোটেই নন। যদিও আইরিশ মহিলা, সিস্টার নিবেদিতার ছিল অন্তর্ভেদী শক্তি। এতে তাঁর কাছে আগত ব্যক্তিদের জীবনে প্রভূত সহানুভূতিও প্রবাহিত হত। সেই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রকৃতি ছিল ওদেশীয়। তবু তাঁর পক্ষে বেদান্তের অনুভূতি লাভে কোনো অসুবিধে ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি নিজেকে বাহ্যজগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি, সম্বন্ধে ভুলতে পারেননি। অথচ নিবেদিতা কত আগেই এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু আজও শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে, মূল্যায়ন হচ্ছে পণ্ডিতমহলে। এখনও ভারতবর্ষ এই দুজনকে মনে রেখেছে, এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কারণ, দুজনেরই অন্যতম অবদান ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন - তুমি ভারতের সেবিকা-বান্ধবী-মাতা হও। সারা জীবন তিনি ভারতের বিভিন্ন উন্নতির জন্য নিজের রক্ত দিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এগুলির মধ্যে একটি। তার মধ্যে আবার শুধুমাত্র শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আলোচিত হলো। এই সার্ধশতবর্ষে নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা হচ্ছে।

"হে দেবী, আপনি গায়ত্রী মন্ত্ররূপা এবং শ্রেষ্ঠ শক্তি।
আপনি দেবগণের আদি মাতা।
হে দেবী, আপনিই এই জগৎ ধারণ করে রয়েছেন।
আপনিই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করেন।"

-শ্রীশ্রীচন্ডী

নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্পকলা

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা। তাঁরই আশীর্বাদে তিনি হয়ে উঠে ছিলেন একাধারে ভারতের সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা। এই মহাপ্রাণা নারী জন্মসূত্রে বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষকে নিজ মাতৃভূমিজ্ঞানে এমন গভীর ও ঐকান্তিকভাবে ভালোবেসেছিলেন যে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসা শুধু ভাবের উচ্ছ্বাস ছিল না - এর পেছনে অপূর্ব ত্যাগ ও সেবা, এ ছিল সম্পূর্ণ আত্মদানের তপস্যা। প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই তপস্যাকে সতীর তপস্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর এমন ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তি ছিল যে তার সেবার জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে নিবেদন করে নিজের গুরুদত্ত 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেছিলেন। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণামাতাজী তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থে নিবেদিতার ভারতপ্রেম প্রসঙ্গে লিখেছেন: "স্নেহময়ী জননী যেমন অহরহ সন্তানের সর্বপ্রকার কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল হইয়া থাকেন, নিবেদিতা সেইরূপ অতন্দ্র স্নেহদৃষ্টি লইয়া ভারতের সমাজজীবনের প্রত্যেকটি দিক পুষ্ট করিয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেন।" নিবেদিতা শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখতেন তা-ই নয়, সেইসব স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য অফুরন্ত উৎসাহে তিনি পরিশ্রম করতেন। ভারতের জাতীয় জীবনে নবজাগরণের উন্মেষের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর অনুপম অবদানের পরিচয় পাই - শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে - কোন ক্ষেত্রে নয়! সত্যই তাঁর এই অবদান ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের উপেক্ষিত নাম ভগিনী নিবেদিতা। বিশেষ করে চারুশিল্প ও চিত্রকলা-ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা অধিকাংশ মানুষের কাছে প্রায় অজানাই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অমূল্য গবেষণাগ্রন্থ 'নিবেদিতা লোকমাতা'র চতুর্থ খণ্ডে সেই অবদানের কিছু অংশ উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে ভগিনীর সেই অসামান্য অবদানেরই স্মরণপ্রয়াস।

নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন, যে কোনও দেশের বা জাতির ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং চিন্তাধারাকে সঠিকভাবে উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সেই দেশের বা জাতির শিল্প, চিত্রকলা ও সংগীত। ভারতবর্ষের কৃষ্টির বৈচিত্র ও গভীর জীবনবোধ সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতা - সংস্কৃতির মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের সুদীর্ঘ সুপ্রাচীন ইতিহাস ও তার বৈচিত্রমণ্ডিত বিশাল ভৌগোলিক ঐশ্বর্য যুগযুগান্ত ধরে ভারতবাসীর মনে যে-শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জাগিয়ে আসছে, ভারতকে জানতে হলে তাকে গভীরভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। শিল্পচেতনা এখানে জাতীয় চেতনারি একটি অমোঘ উপাদান। নিবেদিতা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, ভারতবাসী জানে, মানুষের মনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য শিল্পচেতনা বা শিল্পবোধ অত্যন্ত আবশ্যক।

ভগিনী নিবেদিতা যেসময় ভারতে এসেছিলেন তখন ভারতে শিল্পজগতের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। ব্রিটিশ রাজত্বকাল যে-কয়েকটি আর্ট স্কুল ছিল, সেখানে ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়া হত, ভারতীয় শিল্প অবাস্তব ও দুর্বল - তার কোনও গৌরব নেই।

শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি নিবেদিতার প্রগাঢ় অনুরাগ ও উৎসাহ। পরে তিনি কিছুদিন প্রসিদ্ধ শিল্পী এবেনজার কুকের কাছে শিল্পচর্চাও করেছিলেন, শিল্পচেতনা তাঁর মজ্জাগত ছিল। তাঁর রচনাতেও প্রায়শ পাওয়া যায় শিল্পিত অভিব্যক্তি। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করে তিনি লিখেছিলেন, রাফেলের শিশু যিশুর কোমলতা ও মহিমা তাঁর ললাটে ও চোখে।

ভারতীয় শিল্পে নিবেদিতার দীক্ষা স্বামীজীর কাছেই হয়েছিল। স্বামীজী ছিলেন ভারতাত্মার মূর্তবিগ্রহ, শিল্প বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী। পরিব্রাজক জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা, বিপুল অধ্যয়ন, গভীর রসবোধ ও বিচারশীলতার তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছিল। নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকেই ভারত - শিল্পের অন্তর্নিহিত মর্মার্থ বুঝতে শিখেছিলেন। বিশেষ করে ভারতে আসার পর তিনি যখন স্বামীজীর সঙ্গে ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি ভ্রমণ করছিলেন তখন তাঁর কাছে এইসব বিখ্যাত স্থানের চিত্রকলা, শিল্পসৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা শুনতেন। এমনকী এদেশের খেত - খামার ও জনজীবনের তাৎপর্য, মাধুর্য ও মাহাত্ম্য পর্যন্ত বুঝিয়ে বলতেন স্বামীজী। এইভাবেই নিবেদিতা অজন্তা, ইলোরা, আগ্রা, দিল্লি, কাশী, নালন্দা, চিতোর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ স্থানগুলির শিল্পসৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির স্বরূপ ধারণা করতে পেরেছিলেন। তার নিদর্শন রয়েছে তাঁর লেখা প্রবন্ধ এবং অপূর্ব গ্রন্থগুলিতে - "The web of Indian Life', 'The Footfalls of Indian History', 'Studies From an Eastern Home' ইত্যাদিতে।

স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতের শিল্পের উপর গ্রিক প্রভাব সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতবাদগুলো খণ্ডন করেছিলেন। প্যারিসে যে-পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ন হয়েছিল সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছিলেন ভারতের সভ্যতা, শিল্পচিন্তা ইত্যাদি গ্রিক সভ্যতা বা শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। ভগিনী নিবেদিতা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্বামীজীর সঙ্গে বহুবার তিনি ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ - আলোচনা করেছিলেন। নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েও তিনি ভারতীয় শিল্পের সূক্ষ্ম কাজগুলি এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা যেমন হিন্দুধর্ম, কালীতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে পেরেছিলেন, ঠিক তেমনই আমাদের শিল্পকলা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল অসামান্য। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, তিনি তাঁর পত্রিকায় প্রথম প্রথম কেবল শিল্পী রবি বর্মার ছবি ছাপতেন। নিবেদিতাই যুক্তি দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে রবি বর্মার চিত্রের রীতি ভারতীয় নয়। এমনকী পাশ্চাত্য চিত্ররীতি মতেও তা উৎকৃষ্ট নয়।

ভারতবর্ষে আধুনিক কালের শিল্প আন্দোলনে ই বি হ্যাভেল একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি ১৮৯৬ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই

এখানকার শিল্পশিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। এতদিন ধরে সেখানে কেবল পাশ্চাত্য শিল্পের অনুসরণ করতে শিক্ষা দেওয়া হত। মি. হ্যাভেলই সর্বপ্রথম প্রাচ্য শিল্পের ভিত্তিতে শিল্পশিক্ষা চালু করলেন। এই ধারা পরে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ছাত্ররা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ভারতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণকল্পে মি. হ্যাভেলের সাধনার পেছনে ছিল ভগিনী নিবেদিতার ঐকান্তিক উদ্যম ও সহায়তা। হ্যাভেলের মহাগ্রন্থ "ইন্ডিয়ান স্ক্যাল্পচার এন্ড পেন্টিং ' - এর সমালোচনা লিখতে গিয়ে ভগিনী লিখেছিলেন, "ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকের কলম থেকে এই প্রথম একটি বই পেলাম যার পৃষ্ঠাগুলির সর্বত্র ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জনগণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব প্রকাশিত আছে।"

এক্ষেত্রে হ্যাভেলের যে-কথাগুলি নিবেদিতা উদ্ধৃত করেছেন তা আরও প্রাঞ্জল হবে : "পাশ্চাত্য শিল্প যেন তার পাখা ছেঁটে দিয়ে বসে আছে; তা কেবল পার্থিব সৌন্দর্যকেই চিনেছে। ভারতীয় শিল্প মুক্তপথে দ্যুলোকে উড্ডীন হয়ে সর্বদাই চেষ্টা করেছে সেখানকার কিছু বস্তুকে মর্ত্য সীমায় নামিয়ে আনতে।" ভগিনী অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দেখান যে হ্যাভেল প্রমাণ করেছেন, ইউরোপীয় আর্টে যে-সৌন্দর্য রয়েছে তা পার্থিব, আর ভারতীয় আর্টের সৌন্দর্য স্বর্গীয়।

ভগিনী নিবেদিতা ও হ্যাভেল আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যাতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সমালোচকদের আক্রমণ থেকে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করে বিশ্বের দরবারে তাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া যায়।

এই ধারা পরে ধরে রেখেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ছাত্র নন্দলাল বসু প্রমুখ। অবনীন্দ্রনাথ নিঃসংকোচে বলেছিলেন, ভারতীয় চিত্রকলা ও প্রাচ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে তাঁর যা-কিছু প্রচেষ্টা, তার পেছনে রয়েছে ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণা। চিত্রাঙ্কনে প্রথম প্রথম অবনীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ভাবেরই অনুকরণ করতেন। নিবেদিতাই তাঁকে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণের প্রেরণা দেন। তাঁর বহু চিত্রের সমালোচনা নিবেদিতা লিখে দিয়েছিলেন মডার্ন রিভিউ পত্রিকায়। বিশেষত 'ভারতমাতা' চিত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। চিত্রের সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করে তার ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। প্যারিস থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা বহু ছবির কপি আনিয়ে তিনি মডার্ন রিভিউতে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওইসমস্ত ছবির সমালোচনাও তিনি নিজে লিখে দিতেন। এইভাবে সাধারণ মানুষকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিল্প সম্পর্কে অবহিত করতে চাইতেন নিবেদিতা। তাঁর আরও উদ্দেশ্য ছিল - পাশ্চাত্য চিত্রের নিকৃষ্ট অনুকরণ না করে তাদের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেটি বুঝে এদেশের শিল্পীরা নিজেদের ভাবে ভারতীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করুক।

আর্ট স্কুলে ভগিনী নিবেদিতা বহুবার বক্তৃতা দেন, কিন্তু সবগুলি বক্তৃতা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যেগুলি সংগ্রহিত হয়েছে যেমন - 'জাতিগঠনে আর্টের দান', 'আর্টের বাণী' ইত্যাদি, সেগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় তিনি আর্টের কত বড় সমঝদার ছিলেন।

নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নিবেদিতার কাছ থেকে শুধু উৎসাহ ও প্রেরণাই পাননি, ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের জ্ঞানও লাভ করেছিলেন।

ভারতীয় ভাবধারার পরিচয় ভগিনীর কাছেই এঁরা লাভ করেন। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ কাহিনি অবলম্বন করে ছবি আঁকবার জন্য তাঁদের খুব উৎসাহ দিতেন নিবেদিতা। অসিতকুমার হালদার লিখেছেন, "আমাদের ছিল তখন দেশি শিল্পের গবেষণা-কাল। ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি ও নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজার যেতাম। আমাদের উপদেশছলে বারবার সাবধান করতেন, আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে - সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।... আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে।" নন্দলাল বসুর আঁকা 'দশরথের মৃত্যু' ছবি দেখে ভগিনী খুব প্রশংসা করেন। স্বামীর মৃত্যুশয্যার পাশে কৌশল্যার গভীর অথচ সংযত শোকাহত বর্ণনা করেছেন এইভাবে : "এখানে শোকের অশালীন উচ্ছাস নেই। সবকিছু শান্ত,নিঃশব্দ, নিয়ন্ত্রিত। জলরঙের কাজ। মূল ছবিটি হাতে নিলে তার বিষয়ে মৃদু চাপা-স্বরে কথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না। চিত্রণে এমনই গাঢ়তা যে, মন ভাবনিবিড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।" তিনি আরো লেখেন। : "It may be noted that modern Indian art, at once genuinely modern in born at last."

লেডি হেরিংহাম যখন অজন্তার গুহাচিত্র কপি করতে ভারতে এসেছিলেন তখন নিবেদিতা এসে - ছিলেন তখন নিবেদিতা নিজে টিকিট কেটে, আর্ট স্কুলের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বলে সব ব্যবস্থা করে আর্ট স্কুলের ছাত্র নন্দলাল ও অসিতকুমার হালদারকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁরা লেডি হেরিংহামকে ওই কাজে সাহায্য করতে পারেন এবং একইসঙ্গে কাজ শেখেন, উৎসাহ পান, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। শুধু তা-ই নয়, কিছুদিন পর তিনি চাল-ডাল ইত্যাদি নিয়ে সেখানে যান তাঁদের তদারকি করতে।

নন্দলাল বসু জানিয়েছেন, আর্ট স্কুলে তাঁর আঁকা - কালী, সত্যভামা, দশরথ ও কৌশল্যা, জগাই - মাধাই ইত্যাদি চিত্রগুলি দেখে নিবেদিতা সঙ্গে সঙ্গে তাদের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে বলেছিলেন। নন্দলালের ছবি দেখামাত্র তাঁর শিল্পপ্রতিভা নিবেদিতা বুঝেছিলেন, তাই তাঁকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। নন্দলালের স্মৃতি : "একদিন আমি আর সুরেন গাঙ্গুলী গেলুম সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে।... আমাদের বসতে বললেন। আমরা বসলুম একটা সোফাতে।... সিস্টার বললেন, 'তোমরা আসন করে বস, আমি দেখি।' বলতে আমাদের খুব রাগ হল। মেমসাহেব আমাদের অপমান করল। সিস্টার কিন্তু তখনই বললেন, আমাদের ভাব বুঝে, 'তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভাল লাগে না। তোমরা এই যেভাবে বসেছ ঠিক বুদ্ধের মত। ভারী ভাল লাগছে আমার দেখতে।' " তারপর আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে কিছুক্ষণ তাঁদের দিকে চেয়ে রইলেন। লক্ষ্যণীয়, নিবেদিতা তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শুরু থেকেই শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ এটি আশ্চর্যের বিষয় না হতে পারে কিন্তু সেদিন সেটি একটি বৈপ্লবিক ব্যাপার ছিল। সে-সময়ে ইংল্যান্ডেও শিশুদের কেবলমাত্র কালো রেখায় আঁকতে শেখানো হত। রঙের ব্যবহার

কল্পনাতীত ছিল। শিশুরা অনেক রং ব্যবহার করে রঙের ভাষায় নিজেদের মনকে খুলে ধরবে - এটা চিন্তার বাইরে ছিল। এবেনজার কুক প্রমুখ শিল্পীরা সেইসময় মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে, সকল মানুষের পক্ষে অক্ষরজ্ঞান যেমন অত্যাবশ্যক ও প্রয়োজনীয়, তেমনি সকল শিশুর প্রয়োজন চিত্রাঙ্কনের শিক্ষা। এমন একটি সময়ে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের রং-তুলি কাগজ নিয়ে ছবি আঁকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেন নি। নিজেই খুব উৎসাহের সঙ্গে অনেক যত্নে তাদের আঁকা শেখাতেন। সেলাই ও মাটির কাজও শেখাতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এদেশের মানুষের শিল্পবোধ সহজাত; এবং সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্য ভারতবাসীর রক্তে, তাঁদের ধমনীতে রয়েছে। তাই গভীর ভালবাসা নিয়ে তিনি নিজের ঘরে সংরক্ষণ করে রাখতেন ছাত্রীদের হাতের কাজের নমুনা এবং লক্ষ করতেন তাদের কাজ ক্রমশ সুন্দর ও পরিণত হচ্ছে। তাঁর চিঠিপত্র তাদের হাতের কাজের প্রসঙ্গ প্রায়ই থাকত। তাদের তুলির কাজ কত ভাল, রঙের ব্যবহার কী চমৎকার, তারা কী সেলাই করে লিখতে বা বলতে তিনি কখনও ক্লান্ত হতেন না।

শিল্পকলার জগতে একটি প্রচলিত কথা - Art for Art's sake - কলাকৈবল্যবাদ, শিল্পচেতনার সর্বাঙ্গীন উন্মেষ শিল্পের জন্যই। অন্য উদ্দেশ্য থাকলে শিল্পকলার উন্মেষ পরিপূর্ণ হয় না। ভগিনী নিবেদিতা কিন্তু ভারতীয় জাগরণের জন্যই শিল্পের পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, শিল্পের পুনরভ্যুদয়ের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তাই তিনি চাইতেন জাতীয় চেতনা ও জাতীয় ইতিহাসের উপর শিল্প প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি বলতেন, "জাতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ আমার প্রিয় স্বপ্ন।" ভারত যখন তার পুরাতন শিল্পকে ফিরে পাবে তখনই সে একটা শক্তিশালী জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন, শুধু বিশ্বের দরবারে ভারতকে তুলে ধরলেই হবে না - একান্তভাবে প্রয়োজন ভারত ও ভারতবাসীর কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে উন্মোচন করা। কারণ ভারতীয়রা আত্মবিস্মৃত জাতি। এই প্রসুপ্ত জাতিকে জাগাতে হবে - শিল্পের মাধ্যমেই তা সম্ভব। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, জনগণের কাছে দেশের বাণী, জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে শিল্পকলার মত বাঙ্ময় আধার আর কিছু হতে পারে না। একটি চিত্র বা একখানি সংগীত এমনভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে এবং সকল জাতিকে একসূত্রে বেঁধে দিতেও ও একাত্মবোধ জাগাতে পারে, যা আর কোনও কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে আমাদের শিল্পক্ষেত্রে যে-অবস্থা এসেছিল তা অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত ছিল। ইউরোপীয় শিল্পের হাস্যকর অনুকরণে মত্ত সেই যুগে ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যে ভারতীয়ত্বকে জাগিয়ে ভারতীয় শিল্পের পুনর্জাগরণের প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এই মহীয়সী নারী। শুধু তা-ই নয়, ভারতের শিল্পচেতনাকে তিনি পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

পূর্বে প্রকাশিত : নিবোধত - ৩১ বর্ষ - ৫ম সংখ্যা - জানুয়ারী - ফেব্রুয়ারী ২০১৮

ভারত মাতা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

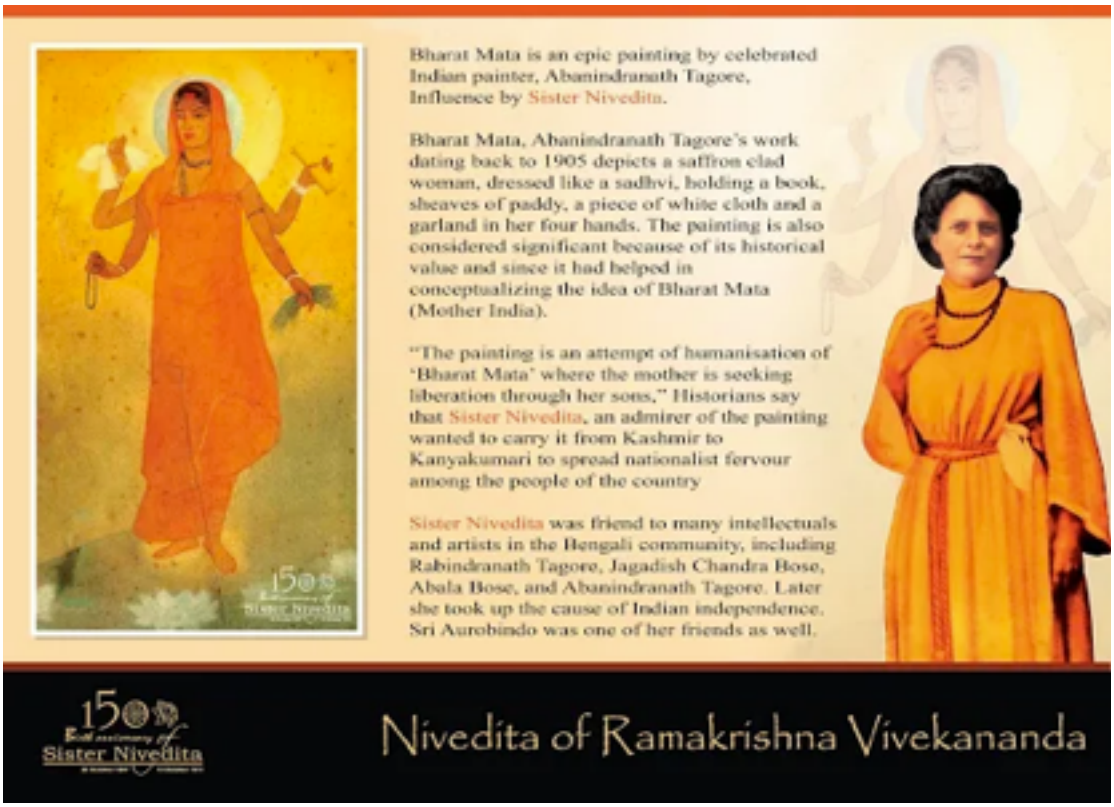

ভগিনী নিবেদিতা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বই মাতৃরূপা কালী পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতমাতা" ছবিটি আঁকেন।

We have taken some of the photos from the internet for the joy of sharing knowledge only in this magazine. For lack of information, we may not be able to acknowledge the names of the original contributors, however, we want to thank them all.

নিবেদিতার স্বপ্ন

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

নিবেদিতার ভারত আগমনের পশ্চাতে একটা নির্দিষ্ট 'মিশন' ছিল, কিন্তু তিনি 'মিশনারি' ছিলেন না। তথাকথিত মিশনারিদের মতো এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যেতে আসেননি। এসেছিলেন সুপ্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার মনোভাব নিয়ে। ভারতবর্ষকে ঘিরে ভগিনী নিবেদিতার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যতদূর সম্ভব তাঁর চিন্তা ও ভাবানুসরণে আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির যথার্থ তাৎপর্য কী অথবা আগামী প্রজন্মের জন্য সে কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে - এসব নির্ণয় করার সময় হয়তো এখনও আসেনি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, নিবেদিতা সেযুগের লন্ডনে নবীন শিক্ষান্দোলন-এর সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসাবে নিজস্ব ধ্যানধারণার আলোকে বিদ্যালয়ের সুচনাপর্বেই নিবেদিতা অনন্য ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী নারীকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুল খুলে অ-আ-ক-খ শেখানোর কাজে কেন আহ্বান জানিয়েছিলেন? স্বামীজীর সে আহ্বানের পশ্চাতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটা মুখ্য ছিল না। কারণ এখানে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এক, বিদ্যালয় শুরু হওয়ার আগে স্বামীজী মার্গারেট নোবেলকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে 'নিবেদিতা' নাম দিয়েছিলেন। দুই, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং, শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে যিনি ছিলেন সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তির পালয়িত্রী। এথেকেই প্রমাণিত হয়, স্বামীজী চেয়েছিলেন ছেলেদের মতো মেয়েদের জন্যও একটি মঠ স্থাপন করতে।

রামকৃষ্ণ মিশন পক্ষ থেকে স্বামী সারদানন্দ বিদ্যালয়ের যে প্রথম কার্যবিবরণী (১৯০৫ - ১৯১২) প্রকাশ করেন তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে - "বিদ্যালয়ের সামান্য সূচনায় প্রস্তাবিত স্ত্রীমঠের 'ভূমিকা' রচনা হল।" স্বামীজীর সেই স্বপ্ন সম্ভব হল যখন দক্ষিণেশ্বর স্ত্রীমঠ স্থাপিত হল আরও ছাপ্পান্নো বছর পরে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে।

নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে যে অল্পসংখ্যক ত্যাগব্রতী মেয়েরা সমবেত হন, তাঁরা ১৯১৪ সাল থেকে বিদ্যালয়ের অদূরে একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। তাঁরা তাঁদের আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন 'মাতৃমন্দির' এবং সন্ন্যাসিনীর মতোই জীবন যাপন করতেন।

নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ ছিল - ভারতীয় মেয়েদের জাতীয় ভাবে দেশীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেই শিক্ষা দিতে হবে। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র নারীমুক্তির জন্য আসেননি, তিনি জনগনেরও ত্রাণকর্ত্তা। স্বামীজীর এই ভাবনাই নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পক্ষে শুধুমাত্র একটি বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা কঠিন ছিল।

স্বামীজী চেয়েছিলেন মানুষ গড়ার শিক্ষা। নিবেদিতা সেটিকে জাতি গঠনের দিকে প্রসারিত করেন। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে এই বিদ্যালয়টি ছিল তখনকার দিনে ভারতের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের মেয়েরা প্রতিদিন প্রার্থনার সময়ে গাইত 'বন্দে মাতরম' - এই সংগীতের ওপর তখন ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহারেও নিবেদিতার আগ্রহের সীমা ছিল না। তাই কোনওরকম দ্বিধা না করে তিনি লেডি মিন্টোকে (তৎকালীন ভাইসরয়ের পত্নী, ১৯১০ ক্রিস্টাব্দে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন) আপ্যায়িত করেছিলেন স্বদেশি কাপ-ডিসে স্বদেশি চা, চিনি ও বিস্কুট দিয়ে। তখন ভারতীয়দের ঘরে ওই স্বদেশি বস্তুর কোনও কদর ছিল না। আবার লেডি মিন্টো যখন ১৯১০-এর ১৮ মার্চ নিবেদিতাকে গভর্নমেন্ট-হাউস-এ ব্যক্তিগত ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখনও নিবেদিতা এক প্যাকেট স্বদেশি বিস্কুট (লেড়ে বিস্কুট) সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এ বোধহয় একমাত্র নিবেদিতার পক্ষেই সম্ভব।

একথা সুনিশ্চিত যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশ থেকে শেখার কিছুই নেই, বরং দেয়ার মতো সম্পদ অনেক আছে। আমাদের সমাজে অবশ্য বর্তমানে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমাজে নতুন যা কিছুর প্রবর্তন প্রয়োজন ভারতীয়রা নিজেরাই করবে। কোনও বিদেশীর তো সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অধিকার নেই।

তিন হাজার বছরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা কি এতই গুরুত্বহীন যে, পশ্চিমের তরুণজাতি প্রাচ্যের মানুষকে দিগদর্শন করবে! ইউরোপে সভ্যতার জন্ম তখনও হয়নি। সেই সুপ্রাচীন কালেই ভারতবর্ষ সভ্যতার মূলভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করেছিল। সভ্যতার অর্থ মানুষের চেতনাকে উচ্চতর মূল্যবোধে জাগ্রত করা, সূক্ষ্ম মহত্তর কৃষ্টির সঞ্চার করা এবং সেইসঙ্গে গড়ে তোলা উদার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় মেয়েরা অজ্ঞ - এমন ভুল ধারণা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। বরং ভারতীয় মেয়েদের সমুন্নত চরিত্রমহিমা, তাদের সহজাত মর্যাদাবোধ, হৃদয় - মনের কোমলতা, যা তারা নিজেদের সহজ-সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই লাভ করেছে-সেগুলিই তো জাতীয় জীবনে মহার্ঘ সম্পদ। হয়তো আধুনিক পরিভাষায় তারা অশিক্ষিত, কারণ তারা নিজের ভাষায় একটি শব্দও পড়তে শেখেনি, নিজের নাম সই করা তো দূরের কথা। তা-সত্ত্বেও শিক্ষা মানুষকে যে উৎকর্ষ দেয়, নিবেদিতার মতে ভারতীয় মেয়েরা তথাকথিত শিক্ষালাভ না করেও তা সহস্রগুণে বেশি অর্জন করেছিল। ভারতে নারীর আদর্শ রোমান্স নয়, ত্যাগ। প্রাচ্যদেশের পক্ষে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করার কোনও আবশ্যকতা নেই। বিদেশের রীতিনীতি, শিষ্টাচারকে অনুকরণ করার হীন মনোভাব থাকবে কেন? পরস্পরের সৌহার্দ্য যেখানে আছে সেখানে হাতজোড় করে নমস্কার জানালাম অথবা করমর্দন করলাম - তাতে কী আসে যায়।

নিবেদিতা চাইতেন, ভারতের তরুণরা যেন মনে রাখেন যে, জগতের অন্য কোথাও, আর কোনও জাতির মধ্যেই ছাত্রাবস্থায় এত উচ্চ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ নেই। নিবেদিতা আশা রাখতেন - প্রতিটি ছাত্রই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। শাসকশ্রেণীর চাপে লেখা এক বিপরীত এবং অর্ধসত্য ইতিহাসের মোহে না পড়ে, তারা যেন স্বদেশকে অখণ্ডরূপে ভাবতে শেখে। অন্যান্য জাতির কাছে ভারতের জবাবদিহি

করার কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতের ছাত্রেরা যেন নিজেদের সাহিত্য - বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে বিকশিত জাতীয় প্রতিভার সমাদর করতে শেখে। নিজেদের অমূল্য শিল্প-সম্পদের প্রতি তরুণসমাজের ঔদাসীন্য নিবেদিতাকে কতটা ব্যথিত করতো, তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তিনিই সেদিন ভারতের শিল্পীদের উৎসাহ দিয়ে প্রেরণাদাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের জাগরণে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে তিনি শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে এক মুক্ত দিগন্ত খুলে দিলেন। নিবেদিতার কাছে শিল্পীরা ছিলেন অনন্ত স্বপ্নের সান্ত রূপকার।
ভারতীয় নারীর ব্যক্তিত্বকে বোঝার মতো অন্তর্দৃষ্টি নিবেদিতার ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল সেখানেই রহস্যের চাবিকাঠি - যা ভারতবর্ষকে সমস্ত ধর্মসমূহের জননী করেছে। বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন - পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ওপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ বেশি নির্ভর করছে।
আমাদের দেশ আজ বিপদের সম্মুখীন। দেশজননী বিশেষ করে এই ক্ষণে তাঁর মেয়েদের আহ্বান করছেন। তাঁরা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।
আজকের ভারতীয় মা যেন তাঁর মেয়েদের একটি জীবনযাপনের প্রেরণা দেন - যার অভাবে জাতি আজ তার অন্তরের শক্তি ও বীর্য হারিয়ে ফেলছে।
প্রত্যেক মা যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তান মহৎ হবে। মায়েরা যেন সন্তানের অন্তরে অপার সহানুভূতি জাগিয়ে তোলেন যাতে তারা অন্যের দুঃখকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে।
নিবেদিতার শক্তিশালী লেখনীতে স্বামীজীরই মহা আহ্বান শুনতে পাই - আমরা যেন আমাদের সন্তানদের স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমরা দেখতে চাই, আমাদের সন্তানরা স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগ করছে। তারা ভারতকে ভালোবাসুক, জ্ঞান অর্জন করুক ভারতেরই কল্যাণসাধনে - এইসব ভাব তাদের নিঃস্বাস - প্রশ্বাসের মতো প্রবাহিত হোক।
এতটাই ছিল নিবেদিতার আশা, নিবেদিতার স্বপ্ন। নিবেদিতার প্রিয় স্বদেশমন্ত্রটি উচ্চারণ করেই শেষ করি। তিনি তাঁর ছাত্রীদের ওই মন্ত্রটি ধ্যান করতে ও বার বার আবৃত্তি করতে বলতেন জপমন্ত্রের মতো। সেই মন্ত্র হল : "'বন্দে মাতরম' - ভারতমাতা, তোমায় প্রণাম করি।"

৬ নভেম্বর'৯৮ ছাত্রীদিবসে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভাষণের অনুবাদ।

'অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা' পুস্তকে প্রকাশিত

স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা

পার্থ পাল

মার্গারেট নোবেল, পরবর্তীকালে সিস্টার নিবেদিতা, সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তার কোনটা সত্যি কোনটা নিছক গল্প গুজব তার চুলচেরা বিচার না করেও এক সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নিবেদিতার জীবনের দিকে তাকালে এমন কিছু অনুভূতির খোঁজ পাওয়া যায় তার অনেকটাই মানবিক আর বাকিটা মহা মানবিক না হলেও মহান অতি অবশ্যই।

জন্মসূত্রে ১৮৬৭ সালে, আয়ারল্যান্ডে। ১৮৯৮ এ যখন মার্গারেট কলকাতায় এলেন তখন তাঁর বয়স ৩১। যদিও বাবা ছিলেন ধর্মযাজক, ত্যাগ বা তিতিক্ষা তখন মার্গারেটের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। দাদা রিচমন্ডের মতে মার্গারেট অল্প বয়েস থেকেই ভাবপ্রবণ এবং “easily attracted to men with intellectual disposition.” স্বামীজীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আর প্রখর বৌদ্ধিক সত্ত্বার দিকে মার্গারেটের মত মহিলা যে আকৃষ্ট হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশ্চাত্যের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাত্রা ছেড়ে ভারতের দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার দিকে নির্ভয়ে পা বাড়িয়ে দিতে সাহস এবং আত্মবিশ্বাস লাগে। সমাজকল্যাণের ইচ্ছেকে কাজে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপে অনেক জাড্য অতিক্রম করতে হয়- এক গৈরিক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ভরসায় এক যুবতী সাত সমুদ্র পাড়ি দিলেন— এটাকে কেবল রোমানটিসিজম বা ব্যক্তিপ্রেমের ব্যাখ্যা দিলে বোধ হয় ভুল করা হবে।

কলকাতা আসার পর মাস দুয়েক কেটেছিল শিক্ষায়। স্বামীজী মার্গারেটকে লিখেছিলেন যে এই সময় ভারতের দরকার এক সিংহিনীর, যে ভারতীয় নারীকে উদ্বুদ্ধ করবে এক নারী হিসাবে। পাশ্চাত্যের নারীশক্তির প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ তিনি চান নি। তিনি চেয়েছিলেন মার্গারেট হিন্দু ধর্ম এবং জীবনদর্শন সম্বন্ধে অবগত হন। আরোপিত দেশাচার আর অনাচারের বাঁধন ভাঙতে গিয়ে যেন ভারতীয় নারীর চিরাচরিত ভাবমূর্তির ভাল দিকগুলো নষ্ট না হয়। পরবর্তীকালে নিবেদিতার লেখায় Kali, The Mother আর The Way of Indian Life এ বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই শিক্ষার প্রভাব প্রচ্ছন্ন। আরব বা জুইশ ভাবনায় ঈশ্বর কেন পান পিতার রূপ, খ্রিষ্টান ভাবনায় সন্তান (ম্যাডোনা)- আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ভারতের ঈশ্বর ভাবনায় মাতৃরূপ— বিশেষ করে মা কালী, যার বীভৎসতা পশ্চিমী চেতনায় প্রায় অবিশ্বাস্য – নিবেদিতার এই বৈদগ্ধ্য অনুসন্ধান এখনো তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পায় নি।

দীক্ষার পর মার্গারেট এর নতুন নামকরণ হয় ভগিনী নিবেদিতা। দীক্ষার ঠিক আগের এবং ঠিক পরের সময়কালের ঘটনাবলি নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন যে মার্গারেট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন যে কেন স্বামীজী তাঁকে কাজে লাগাচ্ছেন না। মার্গারেটের নাকি ইচ্ছে ছিল সন্ন্যাসিনী হবার, কিন্তু স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা দিলেন ব্রহ্মচারিণী হিসাবে। মার্গারেট নাকি মনেপ্রাণে ব্রহ্মচারিণীর পরিমিত জীবন মেনে নিতে পারেননি - কলকাতার মননশীল অভিজাত্য নাকি তাঁর ভাল লাগত। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নিবেদিতার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাই থাকুক, বিদেশিনীর স্বভাবজাত প্রগলভতা সংযত

করার জন্য স্বামীজী যতই কঠোর হন না কেন, নিবেদিতা প্রথম থেকেই মা সারদার “খুকি” আর স্বামীজীর মানসকন্যা, যার উদ্দেশে আশীর্বাদ বাণী হিসাবে স্বামীজী লিখেছিলেন-

Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one

জন্মভূমি, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে অন্য এক দেশকে আপন করে নিয়ে সেই দেশের সমাজ কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করে নিবেদিতা যেন তাঁর গুরুর এই আশীর্বাদকেই কর্মে রূপায়িত করার চেষ্টা করে গেছেন দীক্ষা পরবর্তী জীবন। এটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। কলকাতায় আসার এক বছরের মধ্যে বাগবাজার এ মেয়েদের জন্য স্কুল। তার পরের বছর ১৮৯৯ এ প্লেগ মহামারীর সময় রাস্তা ঘাট পরিষ্কার থেকে রোগীদের পরিচর্যা। শুধু নিজে নয়, চারপাশের লোকজনদের, বিশেষত মহিলাদের শিক্ষা এবং সেবা মূলক কাজে অনুপ্রাণিত করা। বিনিময়ে তৎকালীন মিশনারিদের মত ধর্মান্তরন চান নি, উলটে গুরু এবং মানসপিতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিজেই রূপান্তরিত হয়েছেন।

শুধুমাত্র শিক্ষা ও সেবাতেই তাঁর আধ্যাত্মিক এবং বুদ্ধিগত ক্ষুন্নিবৃত্তি হত না। ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ বোস, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় - তৎকালীন বঙ্গ সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র দের সঙ্গে ছিল তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ।

কর্মসূত্রে যুক্ত হয়েছেন ওকাকুরার সঙ্গে। স্বামীজীর মৃত্যুর পর নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে পড়লেন যে তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেন মানসপিতার অন্য সন্তান রামকৃষ্ণ মিশনের কাছ থেকে যাতে তাঁর নিজের রাজনৈতিকতার কোন নেতিবাচক প্রভাব মিশনের উপর না পড়ে। যদিও স্বামীজীর গুরুভাইদের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ) সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় ছিল নিবেদিতার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

নিবেদিতার লোকান্তর ঘটে ১৯১১ সালে, মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ ১৯০২ সালে। স্বামিজীর সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম দেখা ১৮৯৫ সালে। মাত্র সাত বছরের সমাপতন দুজনের মধ্যে ইহজগতে। সমাজ কল্যাণ এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করার ফাঁকে ১৮৯৫ থেকে ১৯১১ র মধ্যে এই ১৬ বছরে নিবেদিতা লিখে ফেলেছেন পুরান, হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকতা, এবং স্বামীজী উপর গোটা দশেক বই, আর প্রায় হাজার খানেক চিঠি পত্র ও অন্যান্য রচনা যা শুধু নিবেদিতার পান্ডিত্য আর মননশীলতার প্রমাণ নয়, এক নতুন শতাব্দীর নারীর অনুভব আর এক প্রাচীন সভ্যতার পরাধীনতা।

উদ্ধৃতি

"মানুষের সত্যরূপ, চিত্ররূপ, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্ধ শতবর্ষে নিবেদিতা ও তাঁর স্বপ্নের স্কুলবাড়ি

শতভিষা মুখোপাধ্যায়

বাগবাজারের ৫ নং নিবেদিতা লেনের এক আশ্চর্য চকমিলানো দালানবাড়ির কথা এখানে বলবো। প্রায় তিরিশ বছর আগের স্মৃতির আয়নার ওপার থেকে ফিরে দেখা।

এই স্কুলবাড়ি পৌঁছনোর পথে দুটি বিশেষ পথচিহ্ন -- বোরোলীন হাউস ও বড় রাস্তা (গিরিশ ঘোষ এভিনিউ)-র মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপের মতো একলা দাঁড়িয়ে গিরিশ ঘোষের বৈঠকখানা। বোরোলীন হাউসের পাশ কাটিয়ে বাগবাজারের সরু গলির জীবন বেয়ে একটু এগোলেই এক নস্টালজিক সিংদরজা -- অতীত ও বর্তমানের বেড়া। আর এই দরজার সুঠাম পেতলের হাতল ঠেলে ঢুকলেই তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে ভিতরে আসার ডাক দেয় এক তেজস্বীনি মহিলার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

বাড়ির ভিতরে শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, লাল সিমেন্টের বারান্দা, সবুজ সিমেন্টের ঠান্ডা নিস্তব্ধ ঠাকুরদালান -- বড় বড় ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ড দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা। উঠোনের ওপরে খোলা চার চৌকো আকাশ, নিয়ম-নিষ্ঠা-শাসন পেরিয়ে লাল ফিতে সাদা ফ্রক বা লাল পাড় সাদা শাড়ীর কিচিরমিচির। এই সেই ভবিষ্যতের মেয়েরা। যাদেরকে এক শতক আগে পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে বাবামায়েদের কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়েছিলেন নিবেদিতা। তাদেরকে ভিতর থেকে বাইরে বার করার তাড়নায় ছটফট করেছেন, জন্ম দিয়েছেন নিবেদিতা স্কুলের। শুধুই বাড়ির অন্দর মহল থেকে বাইরে বার করে তাদের শিক্ষার অধিকার দেওয়াই নয়, প্রাচীন সমাজের বহুকালের অনুশাসনে চাপা পড়া মনের অন্দরমহল থেকেও নিজেকে বার করে আনার শক্তি দিতে চেয়েছেন তাদের, প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে।

পুরুষশাসিত কুসংস্কারাছন্ন সমাজে বিদেশিনী নিবেদিতার এই যাত্রাপথ কখনোই সহজ ছিল না। কিন্তু যেমন তিনি প্লেগ প্রতিরোধে রাস্তায় নেমে নিজে হাতে আবর্জনা সরাতে পিছপা হন নি, তেমনই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি, বাধা পেরিয়ে এই স্কুলটিকে তিনি দিয়ে যেতে পেরেছেন পরবর্তী সকল প্রজন্মের মেয়েদের জন্য।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সার্বিক উন্নতির দিকে তাঁর নজর ছিল। তিনি আঁকা, হাতের কাজ, নাটক, বিভিন্ন শিল্পকলায় সকলকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। এরই সাক্ষ্যস্বরূপ আজও নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে জড়িত শিল্পবিভাগ ও তাদের বার্ষিক কলা প্রদর্শনী। স্কুলের স্বাধীনতাদিবসের বিশেষ প্রদর্শনী ও বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই শিল্পচর্চার দিকটি তুলে ধরা ছাত্রীদের কাছে এক বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ছিল। বলা বাহুল্য এইসব কাজে ডাক পড়লে ক্লাস থেকে আলাদা করে ছুটি পাওয়া যেত। সে যুগের বিভিন্ন বাঙালী মনীষী ও জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্ব নিবেদিতার গুণগ্রাহী ও বন্ধু ছিলেন। স্কুলবাড়িতে তাদের আসাযাওয়া ছিল। এমনকি সেখানে বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকও হয়েছে (সম্ভবত

আলিপুর বোমার কিছু বৈঠক হয়) । শুধুমাত্র স্বামীজীর যোগ্য শিষ্যা হিসাবেই নয়, সমাজসেবিকা হিসাবে বাঙালি মননে নিবেদিতার এক নিজস্ব জায়গা তৈরী হয় । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লোকমাতা নাম দেন । স্কুলের দেওয়াল, কুলুঙ্গি ও থামের ডিজাইন, স্তবগুচ্ছের মলাট, সরস্বতীর মূর্তি, এ সবই বন্ধুবর নন্দলাল বসুর হাতে করা । আজও মনে আছে সেই সরস্বতীর শাড়ি ও চৌকিতে দিদিদের সহকারী হিসাবে আলপনা দিতে কিরকম একটা রোমাঞ্চ হতো ।

তেজস্বীনি নিবেদিতার নীরব উপস্থিতি রয়ে গেছে বড়দির ঘরে রাখা তাঁর ব্যবহৃত কাজ করার কাঠের ডেস্কে । অসংখ্য চিঠিপত্র, হাতের আঁকা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে । তাঁর কল্পনাপ্রসূত বজ্র চিহ্নে -- যা আমাদের স্কুলের নিদর্শন, স্কুল শুরুর প্রার্থনা সঙ্গীত ও গুরুস্তোত্রে । সর্বোপরি, তিনি যা চেয়ে - ছিলেন -- আমাদের নির্ভীক আত্মচেতনে ও মননে ।

উদ্ধৃতি

"শিক্ষার অর্থ বাইরের জ্ঞান
ও শক্তি আহরণ করা নয়,
নিজের ভিতরের শক্তিকে
সম্যক বিকশিত করে তোলবার সাধনা।"

ভগিনী নিবেদিতা

নিবেদিতা স্কুল

চাহনি

শতভিষা মুখোপাধ্যায়

আমাদের স্কুলটাকে
যদি একটা মুঠোয় পুরে
সৃষ্টির আদি কোনো বিন্দুতে
নিয়ে যাওয়া হয়,
তাহলে সেই বিন্দুর ভেতর ও বাইরে জুড়ে
যা পড়ে থাকবে - তা -
সিস্টারের সেই চাহনি!
স্কুলের সরু গলির সিংদরজা খুললেই
হঠাৎ করে এসে যা বেঁধে
আমায় তোমায়।
মেয়েদের ভেতর থেকে টেনে
বাইরে বার করার ডাক!
আমাদের প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজে
বাড়ির 'মেয়ে', 'বৌ'
হরেক খোলসে কাটছাঁট করে
গুটিয়ে রাখা মানুষটাকে
বার করার ডাক!
প্লেগ ঝেঁটিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের মতো
আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে,
নির্ভয়ে নিজেকে প্রকাশ করার ডাক!
সময় বদলালেও
সমাজ কতটুকুই বা বদলেছে!
অজস্র মেয়েদের জন্য রইলো তোমার চাহনি।

ভগিনী নিবেদিতার শিবজ্ঞানে জীবের সেবা ও তখনকার সমাজ

বিজয় কুমার বসু

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস। বাংলার রেনেসাঁস। সে যুগে বহু মনীষী জন্ম গ্রহণ করেছেন যাঁরা ছিলেন বাণীর বরপুত্র। সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর পূর্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, উত্তর কলিকাতার শিমুলিয়া পল্লীতে ১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন সাধনের জন্যে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ভারতীয় নারীজাতিকে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা স্মরণ করিয়েছেন। স্বামীজীর সুযোগ্য শিষ্যা ছিলেন ইউরোপ মহাদেশের আয়ারল্যান্ডের বিদুষী বুদ্ধিমতী মহিলা মার্গারেট নোবেল। ১৮৯৫ সালে লন্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। পরে স্বামীজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। লন্ডনে স্বামীজী মার্গারেট নোবেলকে কলকাতায় আসার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল নারী শিক্ষা প্রচলনে মার্গারেট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর আদেশ মত মার্গারেট ১৮৯৮ জানুয়ারীতে কলকাতায় আগমন করেন।

সেকালের হিন্দু নারীরা অনেকেই ছিলেন অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সেই নারীজাতিকে স্কুলে নিয়ে এসে শিক্ষা দেওয়া নিবেদিতার পক্ষে সুকঠিন কাজ ছিল। পিতামাতারা তাদের মেয়েদের পাঠের জন্য স্কুলে পাঠাতে চাইতেন না। সেকালে ছয় বা সাত বছর বয়সেই বিবাহ দেওয়া হত। শিক্ষার সেখানে কোনো স্থান ছিল না। সেই সময় ছিল নানা কূপমণ্ডূকতা। ভগিনী নিবেদিতাকে এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। তৎকালীন ইউরোপীয় ম্লেচ্ছ মহিলার পক্ষে দেশের অশিক্ষিত মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আয়ারল্যান্ডের দুহিতা মার্গারেট ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সালে কলকাতায় পদার্পন করলেন। তাঁর বাসস্থান ছিল ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেন, বাগ-বাজার। সেই বাড়িতেই তিনি স্কুল তৈরী করেন। ছোটছোট মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কষ্ট করে মেয়েদের পিতামাতাকে বুঝিয়ে তাঁর স্কুলে নিয়ে আসতেন। প্রচণ্ড প্রতি কূল অবস্থার মধ্যে ভারতীয় হিন্দু নারীদের শিক্ষার জন্য জীবন পাত করতেন। স্কুলের মেয়েদের সত্যিকারের মা ছিলেন তিনি। কিছু হিন্দু বিধবা মেয়েরা না খেয়েই স্কুলে আসতেন। তিনি তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। কলকাতায় আসার পর ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ সালে প্রথম দক্ষিণেশ্বরের রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মা ভবতারিণীর মন্দির দর্শনে গেলেন। যে জায়গা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি। কিন্তু ম্লেচ্ছ বলে তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। পরে কয়েকজন হিতৈষীর সঙ্গে আলোচনার পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে ঢুকতে সমর্থ হন। স্বামী বিবেকানন্দ ষ্টার থিয়েটারে মার্গারেট নোবেলকে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তার কয়েকদিন পরে ১৭ই মার্চ শ্রীশ্রী মা সারদামণির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সারদামণি আদর করে তাঁকে 'খুকি' বলে ডাকেন।

তারপর ২৫ শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবেলকে দীক্ষা দেন এবং ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের পর তাঁর নাম করণ হয় 'ভগিনী নিবেদিতা'।

আনুষ্ঠানিক ভাবে নিবেদিতা স্কুলের পত্তন হয় ১৩ই নভেম্বর ১৮৯৮ সালে ওই ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেন বাগবাজারে। শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী সেই অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারী রূপধারণ করে। ভগিনী নিবেদিতা আর্তের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। এই সাংঘাতিক মারণ রোগকে উপেক্ষা করে তিনি নিজ হস্তে প্লেগ আক্রান্তদের সেবা শুশ্রুষা করেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে তা জেনেও।

নিবেদিতা যতদিন তাঁর নিজের দেশে ছিলেন তখন পত্রপত্রিকা পরে তাঁর মনে হত ইংরেজ কত সুষ্ঠু ভাবে ভারত শাসন করছে। কিন্তু ভারতের রাজধানী কলকাতায় এসে দেখলেন, এই অসহায় ভারত-বাসীদের অন্যায়ভাবে ইংরেজরা শোষণ করছে। কাজেই তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে নিজে এগিয়ে এলেন। নিবেদিতা তাঁর গুরুর দেশ ভারতবর্ষকে প্রাণের অধিক ভালোবাসতেন।

নিবেদিতা নিঃস্বার্থভাবে এবং নিষ্কামরূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন করতেন। স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল সহস্র সহস্র ঐরূপ নিবেদিতা বেরুক এই বাংলা থেকে। নিবেদিতার ব্রত ছিল জীবকে শিবজ্ঞানে পুজো করা। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২ সালের ৪ই জুলাই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে এই মর্ত্যধাম ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ -লোকে যাত্রা করেন। তার কিছু পরে ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ করলেন লর্ড কার্জন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দেশবাসীর স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করলেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু। তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অনুযায়ী মঠ, মিশন ও সন্ন্যাসীরা কোনভাবে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারবেন না। কাজেই সেই সময় নিবেদিতার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের বাহ্যিক কার্য -কারিতার সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো। কিন্তু আলাদাভাবে মঠ ও মিশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোনোদিন ছিন্ন হয়নি।

১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। নিবেদিতা পূর্ববঙ্গে গেলেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

একবার নিবেদিতা তাঁর স্কুলের মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন যে তাদের রানী কে? সবাই উত্তর দিল, "ইংল্যান্ডেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া"। নিবেদিতা দুঃখিত হলেন এবং তাদের ভুল সংশোধন করে বললেন, "ভারতের মহারানী সীতা"।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এমনকি বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ভারতবর্ষে জাতিভেদ, বর্ণভেদ নারী ও পুরুষের তৎকালিন বৈষম্যবোধ, নিবেদিতা তাঁর শিক্ষার দ্বারা মুছে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন বক্তৃতার মাধ্যমে।

১৮৯৮ সালে জগদীশ চন্দ্র বসুর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পরিচয় হয়। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দরজার গায়ে ভগিনী নিবেদিতার রিলিফ মূর্তি স্থাপন করা হয়। এইভাবে আচার্য জগদীশ চন্দ্র

বসু ভগিনী নিবেদিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ১৯১০ সালের মে জুনে নিবেদিতা জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর সঙ্গে কেদারনাথ বদ্রীনাথ তীর্থ দর্শন করেন।
কঠোর পরিশ্রমের ফলে নিবেদিতা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিংয়ে এই মহীয়সী মহিলা রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন।
নিবেদিতা ছিলেন ভারত প্রেমিক, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর পুণ্যভূমি। তাঁর কাছে ভারতের মানুষ পুণ্যাত্মা।
নিবেদিতার লেখা "The Master as I saw him", স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে লেখা বই, ১৯১০ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়।
পরাধীন ভারতবর্ষকে এত আপন করে ভালবাসতে বোধহয় ভগিনী নিবেদিতার মত কোন বিদেশিনী পারেন নি। তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদ জাগানোর জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন।
যথার্থই তাঁর গুরুদেবের দেওয়া নাম কে সার্থক প্রমাণিত করেছেন।

উদ্ধৃতি

"তাঁহার কর্ম পরিণত হইয়াছিল উপাসনায়; আর সেই উপাসনার ক্ষেত্রে জগজ্জননীর সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন ভারতমাতা। বস্তুতঃ সমগ্র জীবনকে তিনি অখণ্ড সাধনায় পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই নিজেকে দেবতার চরণে নিঃশেষে উৎসর্গ করা তাঁহার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়াছিল। ... নীরব, অনলস কর্মের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আত্মবিসর্জন - ইহাই নিবেদিতার ব্রত। আর নিবেদিতা জানিতেন, 'ব্রতের উদযাপনে প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নহে।' "

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

The Summer of 1902

A few Significant Days in the Life of Sister Nivedita when the Course of Her Life Took A New Turn

Sumit Nag

Prior to meeting Swami Vivekananda at Lady Isabella Margesson's residence in London in November 1895, Ms. Margaret Noble, later famously known as Sister Nivedita, was running a Kindergarten school at Wimbledon, England. During that period, she was also deviating from the orthodox Christianity and had been writing and lecturing on Education theory and politics.

Swami Vivekananda, known as 'Swamiji, was an ardent devotee of and an articulate and charismatic spokesperson for the spiritual leader Sri Ramakrishna Paramhansa. Ms Noble met Swamiji for the first time, when the latter was touring England, as a part of his mission to spread the knowledge of Hindu religion and philosophy in the western countries. Ms Noble was transfixed and deeply moved by the content and style of fiery rendition of Swamiji's lecture at the first meeting.

Then a series of further meetings and interchange with Swamiji effectively changed and transformed her to the extent that it culminated in her leaving England, and reaching the shores of Calcutta in January 1898, to follow Swamiji's teachings and mission of service. That was the beginning of a journey we all are somewhat familiar with.

Ms. Noble was given the name "Sister Nivedita "by Swamiji, once she had declared herself devoted to following the spiritual path of Advaita Vedanta, a branch of Hinduism with a somewhat varied expression and interpretation. The chief proponent of this religious view was Sri Ramakrishna in India, and the spiritual ambassador to the west was his closest disciple, Swami Vivekananda.

Nivedita's direct association with Swamiji had lasted for only about four and a half years until his death on July 4th, 1902. The first major inner change in Sister Nivedita had started in 1895, when she was drawn sufficiently to a philosophy and religion of another part of the world, which made her want to leave her home in England, and dedicate her whole life in the service of that new spiritual path. The catalyst for this remarkable transcendental change was Swamiji, whom Sister Nivedita accepted as her spiritual guru.

That summer of 1902 marked another watershed in Nivedita's life. It was a time of another transformation, when she made some of the most crucial and difficult decisions of her life and work. It also marked the beginning of the second phase of her life in India, that lasted till the day she died in 1911.

In this note about those hot sultry summer days of 1902, we will try to give glimpses of Nivedita's days and nights in India, her internal struggles, her examination of what her true goals were, and her looking to the directives of her own conscience. These insights have been gleaned primarily from her letters written during that period.

A letter written in April of 1902 shows Nivedita's busy travel plans in the uncomfortable weather conditions of a new country just to do her Guru, Swamiji's bidding for humanitarian service and the spread of enlightenment to various parts of India.

Swamiji himself, had travelled to Buddha Gaya on a mission in April of 1902, despite the inclement heat and humidity. On Monday 28th April, he took a break from his exhaustive pilgrimage, and appeared in front of Nivedita's doorsteps in Calcutta. Nivedita was overly elated to see her Guru on such a surprise visit.

That day, she herself had been busy packing for her own trip to Mayavati, a city in U.P, where an ashram of Ramakrishna Mission was being established and Nivedita had been charged with the task of advancing its cause and goals. She was to go with Sadananda, a nephew of Swamiji, and Kakaju Okakura, all fellow disciples.

In a letter to Miss MacLeod, a friend and another devotee, Nivedita wrote they would be leaving in the evening of Monday, May the 5th. However, in Swami Swarupananda's diary, we find that Nivedita and Okakura, arrived in Mayavati on Tuesday, May the13th. The delay was possibly due to Sister Nivedita's wanting to spend more time with Swamiji, imbibing his powerful words and being further inspired by him. It was not easy to travel around in India in those days, especially for a woman, and the change of travel plans for so many in the entourage was doubly problematic. But Nivedita bore such inconveniences with devotion and grace for the sake of Swamiji, whom she referred to in her writings as her "Master."

Another letter was written on a Sunday morning, May the 25th, 1902. About two weeks had passed since Nivedita had come to Mayavati. She was trying to

gather her thoughts about Swamiji and communicate all that to Miss J MacLeod. She wrote to her that she hoped and prayed that He (Swamiji) would remain healthy and strong enough to fulfill the requirements of the program arranged by Miss MacLeod. She also said that Okakura believed that he could help Swamiji achieve that. Swamiji, in fact, was quite ill at that time. Despite his poor health, however, he pressed on, unstoppable, and Nivedita wondered if she would ever see Him be able to rest.

Nivedita expressed to Miss MacLeod that she felt an adoration for Swamiji and desired to truly serve Him. She wished that he would widen his sphere of influence outside of India. She did not believe that his term of powerful service should be time limited and only be confined to India. She thought that His presence being limited to India could thwart his goals of service. Nivedita wrote – "*I believe that the service He would long ago have asked from me at this point would be simply to lift the colors for Him, in the thick of the night, keeping personal emotions at arm's length, lest it dims the eye or cause the hand to shake."*

Nivedita was planning to leave Mayavati in the middle of the month of June, on the16th or the 17th, with a choice of destinations to either go first to Almora or go back straight to Calcutta. Nivedita's preference was to go back to Calcutta as soon as practical, as she felt that her stay at Mayavati was turning out to be a waste of time. She realized how difficult it was for a woman in India to work hand in hand with men. She expressed her frustrations to her friend – "*I feel that if Nigu (*Mr. Okakura) *had been a woman or a child, I could have had with him the most exquisite friendship. As he is a man I do not feel that I could dare, or perhaps rather ought to dare, to indulge this possibility so completely. It is really a common mind and interest that produces the bond between Our Work, but you know what Hindu society is*."

By the end of June, Nivedita was back in Calcutta and was staying at 17, Bose Para Lane in Baghbazaar. On Sunday, June the 29th, she went to see her Master at the Math. To her relief, Swamiji looked so much better when she saw him. He blessed her with great softness as she left that day.

Nivedita was planning to go see him again on Wednesday, July 2nd of 1902. It was extremely hot in Calcutta as it had not rained for quite a few days. Despite the heat, she visited Belur Math that day to see Swamiji, who insisted that she partake of a meal there. It was a simple fare. But what struck her most was that Swamiji insisted on washing her hands with water after she was done eating. He

also dried her hands with a towel. When she asked Him why He did that, He said, “Didn’t Jesus wash the feet of his disciple?”
At that Nivedita felt like saying – “But that was the last day of Jesus in this world.”
The above missives show Sister Nivedita’s devotion to the principles of Ramakrishna Mission, and her intense desire to follow the spiritual and humanitarian path mapped out for her especially by Swamiji. But they also indicate her burgeoning frustrations about the plight of women in India, and the gender-based limitations imposed by the society.

Nivedita’s passion to do something for the people of India, especially for the women in terms of their education and independence arose from Swamiji’s own conviction, that the power to reform the country lay in tapping the innate strength of Indian women, the flow to be enhanced by supporting them with proper education and the will to stand on their own strong feet.

Swamiji spent a considerable amount of his lifetime in the United States of America. Obviously, he liked much of what he saw in the USA. But what really intrigued him about the country was not the sheer wealth, and freedom, but the women, particularly the education they received. In 1893, Swamiji wrote from Chicago to his friend in India – “*I have never seen women elsewhere, as cultured and educated as they are here*”. That’s why when he met Ms. Margaret Noble in England, he invited her to come and join him in India to spread education among women.

It is said that Swamiji had the special blessings of Shiva for a voluntary death. Nivedita remembered Swamiji saying to her – “*That will be a great death that I shall die, saying Hara! Hara! Hara!*” (Shiva! Shiva!). This came true on July 4th of 1902. If we assume that Swamiji voluntarily timed his death, it remains a mystery as to why he had to choose that particular day, the Independence Day of the USA. Interestingly enough, on July 4th, 1898, he also wrote a poem “To The Fourth of July” glorifying America’s liberty.

On July 10, 1902, just a few days after Swamiji had passed away, Nivedita went to the Math to see Swami Brahmananda and Saradananda. She talked at length with them about her political affiliations. It was a change in the direction and manner of service that was churning in her.
When the Ramkrishna Mission Ashram was founded in 1897, Vivekananda had written in its aims and objectives that the organization would be purely spiritual and humanitarian and would not have any connection with politics.

Thus, when Nivedita decided to get involved with the Indian national politics, it meant that she had to cut off all her ties with her beloved Ramkrishna Order to be in accordance with its non- political mission statement.

Even as she was preparing herself for a lecture tour to preach nationalism and Vivekananda's nationalistic ideas, and not just his humanitarian vision, she was also preparing to compose that fateful letter to sadly sever her ties with that anchor that she had crossed seven seas to find.

On Friday July 18thof 1902, she wrote the following letter to Swami Brahmananda to officially communicate her intent, a decision that must have been heart-rending for her.

Dear Swami Brahmananda,

Will you accept on behalf of the Order and myself my acknowledgement of your letter this morning. Painful as is the occasion I can but acquiesce in any measure that are necessary to my complete freedom.

I trust however that you and other members of the Order will not fail to lay my love and reverence daily at the feet of the ashes of Sri Ramkrishna and my beloved Guru.

I shall write to the Indian papers and acquaint as quietly as possible with my changed position.

Yours in all gratitude and good faith,
Nivedita of Ramkrishna Vivekananda.

"মানুষের সত্যরূপ, চিত্ররূপ, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"Most of us will find that we were born for service. We must leave the results to God. If failure comes, there need be no sorrow. The work was done only for God. - Swami Vivekananda"

— Master As I Saw Him
by
Sister Nivedita

Letters of Sister Nivedita

Nivedita wrote many letters to people in India and abroad. Among these letters, the letters written between 1897 and 1911 have special significance. 1897 is the year she came to India renouncing her old way of life and became Nivedita the dedicated one, dedicated to India. 1911 is the year of her death. These letters are significant in many ways. They reveal how deeply she loved India and overcame the western prejudice to sincerely appreciate the glorious heritage of India. Many recipients of these letters were eminent Indians, who, along with her, had been the ushers of India's spiritual and cultural renaissance.
The maximum number of letters were written to Josephine Mcleod and Mrs. Ole Bull, American friends of Swami Vivekananda, who helped and supported Sister Nivedita right from her arrival in India. Some of these show how she encouraged the revival and pursuit of Indian artistic tradition.

Letter to Miss. MacLeod
Aug 19, 1999
21, High Street, Wimbledon

My sweet Yum Yum,

Your registered letter has just arrived containing 2 post office orders for £10.5.4 each—making a total of £20.10.8. I do not expect my ticket to cost more than 10 guineas, but there is another £2 to Glasgow, which will bring it close upon the £15 you name, and the balance I shall hand over to Mrs. Bull on landing, but it is a great relief to have it—in case any difficulty about certain books Swamiji ordered—for which I hope to get Mr. Sturdy to pay.

Of course what you say is quite true about my waiting a month. I am only grateful and obedient to those beloved ones who have so much experience and who will use it all to give me a chance of doing royal work. I wish I were on my way to you now, but how you will love having the King to yourselves! And it is clearly my duty to see Nim through—up to September 6th is a transition period. The day after I start for America a free woman.

My dearest Yum, when you talk about clothes I feel just a humbug. What renunciation can there possibly be in having one's clothes looked after by Mrs. Leggett and you ? You know very well that I never did have clothes—and though

I love pretty ones I really think I like them better on you ! It is quite absurd of me to make professions and things and come out richer than I ever was in my life. That's about what it amounts to. Money was always more or less of an anxiety and difficulty and now—when I really meant to be poor—it is a matter of indifference ! This is not right ! However, Dearest, you know best about this first month—and I shall obey—and then we can settle all the rest.

As to Mr. Sturdy, by this time you know that he has been— and when Swami comes you will hear what he has to say. I can only say that Mr. Sturdy's marriage never seemed to me a fatal mistake till I saw the moral rot that seems to have set it in his character. As Nim and I say to each other—to be Swami's chief disciple and the one on whom all depends is too great a privilege for anyone to be forced into it. He pleads expense as a reason for not going to America with me—and so, with solid treason I feel sure, do the Ashton Jonsons. They would love to come—but for this year they simply "cannot." What the King says is true—"When I come back to London Margot, let it be as though I had never been here to do a stroke of work." That is the only way—but we shall do great things here for all that. If I were staying, even now, I could make things open up.

Again Swami is right. Work like this requires persons like you and myself who have no other object or thought in life. The Householder Disciple is always a failure, when he leads. As follower he does very well.

By the time you get this letter you will have Him with you— so you will easily be tired. I think of leaving the Diaries* as they are, and sending them on uncopied and unbound, by registered post, because the sooner they are in your hands the better I now think. I allowed Mr. Sturdy to read them through—and only you can settle who else shall see them. Many and many a bit I'd love the King to see—If I didn't know he was looking. In a general way, I would like him well enough to read them, but when it comes down to detail ---------

I can see quite well however that S. Sara might think with a little re-editing that they should be privately circulated. She would do that best—and you umpire.

Margot

Letter to Swami Vivekananda
Aug 23, 1899, Wednesday morning
21A High Street, Wimbledon

My dear King*

In a few days more you will be at New York where I hope and believe that Yum herself will meet you.

I do hope that the sea has been rough enough to do you good, and that Miss Greenstidel and Mrs. Funke have enjoyed the voyage. It was a great pleasure to receive a letter from Londonderry—but as I do not know anyone's Detroit address, I cannot thank Mrs. Funke for it. You will have lovely days of real quiet with Yum and her sister and Mrs. Bull at Ridgely. How you will all love it! It is so lucky—your arriving while the others are in camp. I saw the Hammonds yesterday and had a couple of hours alone with Mrs. H. at night, here. How wonderful she is ! She is simply a battery charged with devotion, it seems to me.

She says the first time she saw you, as you entered the club room, she knew at once your significance to her and turned and said to her husband : "This is he for whom we waited." About her vision she says she told you "I am just as inert as Mr. Sturdy." She says: "There is nothing to do but to stand aside. You see it's all done—It's all right now !" But I am much mistaken if some day the Hammonds and Thomson both do not follow more or less in the footsteps of the Seviers.
I had a visit from your disciple—Miss Frances Williams of Epsom—who spoke with tremendous feeling of the peace and meaning that you had brought into her life—by a sentence in a lecture here and there—and then by just a word about concentrating her mind on the heart. She cannot tell what it means or why it helped her. She said, but as a matter of fact her life is now satisfied and at peace. She insisted on giving me a guinea towards my work—with which I have started an account in the Post Office—and says that to help us will be something to live for ! Poor soul. She came to hear about India but I discovered that she had once been in a convent—and I kept her talking about rules and organization.
You have not sent me any list of books on Assyriology and Egyptology yet, though I gave you Mr. King's letter. But after all, they can easily be ordered even from America and you shall have the Maspero's.

I read a most refreshing letter from a Miss Poster this, morning—written to Mrs. Coulston—saying "When Ramabai was here I went to hear her lecture, expecting

to see a genuine lady, and to be told about her work. You can imagine my disgust when I found her to be a coarse termagant who had nothing to offer in but vituperation pure and simple." Even if this had not been as a sniff of the war blast to my martial nostrils I should have taken a good deal of carnal gratification out of it!
I leave Glasgow or Liverpool (wherever I get a ticket) Sept. 7th and may have to take a night train after the wedding to do it. I expect to learn my fate tomorrow—but if I carry out my plans, I shall arrive in New York about the 17th on the Mongolian of the Allan Line.

The McNeills send their love to Mr. & Mrs. Leggett. Mr. McNeill thought the English and Americans were fated to possess, the earth—instead of the meek—but when I said something about the freedom of personal attack in America he said he must reconsider this opinion—with regard to the Americans !

The quiet assumption of respect for you in every way by men like this—who stand outside the circle of partisans altogether is a most soothing part of English life to.
Your Daughter
Nivedita
*Swami Vivekanand

Quotations

"Hinduism would not be eternal were it not constantly growing and spreading, and taking in new areas of experience. Precisely because it has this power of self addition and re-adaptation, in greater degree than any other religion that the world has even seen, we believe it to be the one immortal faith."

Sister Nivedita

"If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realization. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and to avoid."

Sister Nivedita

Prayer

Empowers Womanhood

It is the little school that Nivedita had set up that has grown to be the living Monument.
Thousands and thousands of girls and women are receiving a truly national education in this noble institution.

She came, She lived, She served
and
gave her all to India

HINDUISM - AN ORGANIC ENTITY

Shankari Basu

Hinduism to me, is not mere philosophy/religion but a living and breathing entity, because it is consciousness, it evolves and reproduces just like any other living organism. The only difference that it has with other living things is that Hinduism never grows old, it is ever young and it never dies, because the Atman can never die. Hinduism adapts itself to changes in the environment over time, winning the battle for the survival of the fittest just as Charles Darwin has proclaimed, and hence Hinduism will never become extinct from the face of the earth.
Let us look into these "living" characteristics one by one.

Consciousness:
Hinduism believes in the presence of an universal consciousness called Brahman or Atman.

At the entrance to the CERN at Geneva, Switzerland is a huge statue of the Nataraja. Scientists at CERN, working with the Large Hadron Collider, are stuck with what they call the hard problem of consciousness, as the framework of particle physics is restricted to concepts of time and space within which it operates. Albert Einstein's greatest regret was that he could not complete his "Unified Field Theory" which would propose a single explanation for all the fundamental physical forces. Stephen Hawking called it "seeing inside the mind of God". Today scientists call it the bio-entanglement theory and a special branch of science has been assigned to it, called Noetic Science, to understand a non-physical dimension of existence. At the Higgs-Boson level, scientists have seen only an opaque cloud.

From the moment that life starts as a zygote, or the fertilized egg cell, there is consciousness. The single cell that is comprised of atoms and molecules that are a part of its protoplasm and nucleus are all inert, and as yet there is no brain. Fifty replications and a hundred trillion cells later, the fetus gets differentiated into tissues, organs, limbs, etc. Yet right from the start there is memory/samskara of generations . The body becomes a vehicle for consciousness to gain expression throughout the duration of one's life, as the individual atman. Upon death, in Hindu belief, the physical/gross body perishes, and the mind/ subtle body takes another physical body, while for enlightened souls there is moksha as the atman merges with the universal Atman.
" Ajo nityah shaswatohyam purano / na hanyate hanyamane sharire". Gita 2:20

Evolution:
Hinduism gives us options. From time immemorial, the practice of religion in India has developed along three parallel strands - the Shramana traditions, image worship and Vedic rituals. A devotee practices along any one or all of these strands without even realizing that he/she is doing so, as there is no conflict among them, in fact each one complements the two other. Over time these strands have evolved and Hindus have made their choice, either by family tradition, or collectively when society had an urgent need for change. Shankaracharya's commentary on the Upanishads in the 8th century C.E and the Bhakti movement of the 12th century C.E are two such examples of collective renascence, when religious decadence within the society and foreign influence made reforms to our religion imperative.

Every religion has a broad spectrum of beliefs - from orthodox to liberal - and one chooses a path according to one's own temperament. In Hinduism, it is important to remember that the Shrutis are timeless and unchangeable insights of our rishis, just as the Laws of Gravitation existed long before an apple fell onto Isaac Newton's lap and something in his brain clicked. But Smritis are social norms that have, and are changing with time, and none of it is set in stone. The Indian Constitution is an example of a modern smriti.

The Shramana wisdom has evolved into the path of Jnana, image worship to Bhakti, and Vedic rituals to Karma yogas of the Gita. It is of interest to note, that the human brain is also divided into three parts - the cortical brain for intelligence and the fine arts, the limbic brain for emotions like love and hate, and the mid brain for fight or flight actions, corresponding to Jnana, Bhakti and Karma yogas respectively.

Hinduism is the only religion that believes that all other religions are also valid paths for realizing the truth, and not only tolerates them, but accepts them wholeheartedly.

Reproduction:
From the Shramana traditions have arisen all the six schools of Hindu philosophy/darshana, as well as Jainism and Buddhism. Sikhism grew out of the Bhakti movement some three centuries later. Hence Hinduism has not failed to live up to the third criterion of a living thing- that of reproduction. All these different religions have one thing in common - they all believe in rebirth/ reincarnation- the womb as if it were, from which they all sprang.

Reincarnation has been scoffed at by the western world, but consider this: a giraffe did not get a longer neck overnight to reach the upper branches of trees to get food to survive. This had to happen through several generations of giraffes over hundreds or thousands of years. How then was this teleological urge to possess a longer neck transmitted from one generation to the next? Is it not the information carried through the mind of one generation that was reborn into subsequent generations bringing about gene mutations until the required length of the neck was achieved, and their desire fulfilled? It has been proved scientifically that a shift in consciousness can bring about a change in biology. Do we not know of the occasional 'jaatiswar' who can recall flashes from past generations? Perhaps they had certain dreams unfulfilled in their last birth and were born again to fulfill those dreams.

Many of the mysteries of this universe, which cannot be explained by material science, had become clear to our rishis, who gained wisdom through yoga which focuses the mind like nothing else can. This knowledge was possible as they had been able to transcend the physical body, and hence, the concepts of time and space. There is good news for us all - our religion promises that each one of us can experience the same knowledge if we can learn to focus our mind by shutting out the sense organs, through which we get the sense of time and space. We can then realize that we are all like waves in the ocean, now rising and now falling, only to become undifferentiated in the vast ocean of consciousness. Till such time, we will have to trust the enlightened sages (our ancestors) and take their word, living a life with awareness that will take us as close as possible, to that pure-shining-bliss called Sacchidananda.

"Tat twam asi". That thou art. Chhandogya Upanishad

Writer's note: The above article is written with knowledge gleaned mainly from the writings of Swami Vivekananda and lectures of various swamis at the Vedanta Societies in the U.S.

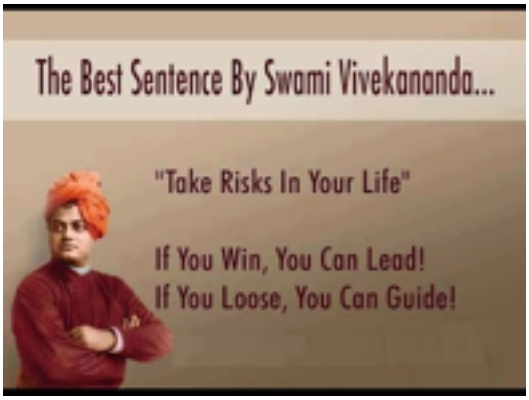

ডাক্তার - রোগীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে

ডাঃ শঙ্কর নন্দী

ডাক্তারদের অভিমত :

আমাদের সমাজের বিরাট ব্যর্থতা এই যে, অধিকাংশ রোগীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও স্মার্টনেস-এর নেহাত অভাব। আজকালকার দিনেও নিজেদের রোগ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁরা এতই অজ্ঞ থাকেন। ডাক্তারদের কাছে এসে কোনো কিছু গুছিয়ে বলবার মতন বুদ্ধি ও বিদ্যা অল্প কজনেরি থাকে। রোগের সাধারণ হিস্ট্রি জানতে গিয়ে অবান্তর বর্ণনা শুনে সময়ের এত অপচয় হয়। নিজস্ব পূর্বতন রোগ বা বংশগত কোন ব্যাধির খবর তাঁদের জানা থাকে না। পারিবারিক দুঃসময় বা কর্মক্ষেত্রে অশান্তির খবরও তাঁরা সহজে প্রকাশ করেন না। অথচ, এই সব ফ্যাক্টরগুলো সঠিক ডায়াগনোসিস-এর ব্যাপারে খুব প্রয়োজন হয়। আর দুঃখের কথা, লাইফ-স্টাইল সংক্রান্ত নানা অনভ্যাস বা বদভ্যাসের ব্যাপারেও তাঁরা সম্পূর্ণ অনেস্টি দেখান না। তারপর, চিকিৎসা ও তার আনুসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কোনো নির্দেশ ফলো করার মোটিভেশনও তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। দায়িত্ব নেবার এহেন ব্যর্থতা চিকিৎসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ, অসুখের উপশম না হলে তাঁরা ডাক্তারদের অভিযুক্ত করেন। এমন কি দলবদ্ধ হয়ে শারীরিক হেনস্থা করতেও দ্বিধা করেন না। এই পরিস্থিতিতে পারস্পরিক কোনো বিশ্বস্থ সম্পর্ক ও সৌহৃদ্য গড়ে তোলা প্রায় দুরূহ।

রোগীদের অভিযোগ :

ভগবান যদি ডাক্তারদের আর একটু মানবিক ও সংবেদনশীল করে গড়তেন। যদি তাঁদের গড়নে কিছু মাত্রা দয়া ও ধৈর্যের প্রলেপ লাগিয়ে রাখতেন। চেম্বারে বা হাসপাতালে নানা সাগরেদ পরিবৃত ডাক্তারদের ত্রস্ত ও রুক্ষ মনোভাব কার না অভিজ্ঞতা। অসুখের কথা নিয়ে মুখ খুলবার সময়, সুযোগ বা সাহস কজনের কপালে ঘটে। অল্পক্ষনের মধ্যে কথা থামিয়ে দিয়ে তাঁরা ডাক্তারী ভাষায় কিছু বক্তব্য বা উপদেশ শুনিয়ে ভিজিট শেষ করে দেন। আর রোগীরা ফি জমা দিয়ে ল্যাবের চিরকুট বা প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে দিশেহারার মতন চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। কী রোগ, কী ভবিষ্যৎ, কী করণীয় - কোনো আইডিয়া বা কিছুই বোধগম্য হলো না। ডাক্তারদের কমপ্যাশন-এর অভাব এত কেন হয়!

দুপক্ষের এই যুযুধান পরিস্থিতিতে রোগীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। কেউ কেউ ইন্টারনেট সার্চ করে বা অন্য মাধ্যমে বিশেষ রোগ সম্বন্ধে সীমিত জ্ঞান অর্জন করে তা নিজের ওপর আরোপ করছেন চিকিৎসকদের এড়াবার জন্যে। অথবা, যথার্থ সময়ে কোনো সুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ইতঃস্তত বা বিলম্ব করছেন বলে রোগের পরিণতিও সুফলপ্রসূ হচ্ছে না। আফশোসের কথা, ব্যস্তপ্র্যাক্টিস-এ রোগীর কোন অভাব হয় না বলে ডাক্তারদের মনোবৃত্তি বদলায় না। তাঁরা ক্রমশ

রোগীদের সঙ্গে কম সময় কাটাচ্ছেন, এবং ল্যাব ও স্ক্যান-এর ওপর নির্ভর করে রোগ ডায়াগনোসিস করছেন। রোগীরা তাঁদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষন করছেন - সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকছেন। রোগীদের এই ডাক্তার বনবার প্রবণতা অধিকাংশ সময় বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা। টোটকা ওষুধ ছাড়াও নানা এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ভারী ওষুধ বিনা প্রেসক্রিপশনে দোকানে পাওয়া যায়। - যার যথেচ্ছ ব্যবহার অনভিপ্রেত ও ক্ষতিকারক।

অবশ্যই আমরা সবাই জানি, প্রায় সব ডাক্তারি চিকিৎসায় সামগ্রিক ব্যয়ের বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও দ্রুত চিকিৎসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর, অধিকাংশ চিকিৎসকের সুবিদিত অনীহা ও মানসিকতার অভাব রোগীদের নিরুৎসাহ আরো বাড়িয়ে দেয়। বিদেশে ডাক্তারদেরই নানা অর্গ্যানাইজেশন আছে যাঁরা এ ব্যাপারে সচেতন শুধু নয়, এই প্রতিকূল অবস্থার সংশোধনে নানা ব্যবস্থা নিতেও শুরু করেছেন। বহু সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেয়ার দল, যাঁদের হাতে ডাক্তার এবং হাসপাতালের পে-মেন্টের চাবি কাঠি থাকে, তাঁরা এখন রোগীদের কাছে "স্যাটিসফেকশন সার্ভে" ও অন্যান্য প্রথায় ডাক্তারদের উপযুক্ততার মান রোগীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার এবং চিকিৎসার উৎকর্ষতার মান, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন। সেই ভিত্তিতে তাঁদের প্রাপ্য টাকাকড়ি ও খবরদারি ধার্য করেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই "দোষী" ডাক্তারদের তাঁদের লিস্ট থেকে বরখাস্তও করে দিচ্ছেন। আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসার খরচও অধিকাংশ সময়ে কোনো বিশেষ মেডিকেয়ার কোম্পানি থেকে আসে না। কাজেই, ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির ও বিশ্বাসের আবহাওয়া গড়তে হলে দুপক্ষেরই সচেতন ও নিজেদের attitude পরিবর্তনে আগ্রহ দেখানো প্রয়োজন হবে।

<u>ডাক্তারদের কি করণীয়:</u>

একজন "ভালো" ডাক্তারের প্রোফাইল:
একজন ডাক্তারের কাছে আমরা কি আশা করি?

(১) ডাক্তারী বিদ্যায় পারদর্শিতা বা 'কম্পিটেন্স'

(২) সংবেদনশীল মানসিকতা বা 'কমপ্যাশন'

এই দুয়ের সংমিশ্রনেই শুধু ভাল ডাক্তার হওয়া যায়। যিনি কথা শুনতে অমনোযোগী, কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্থ - অর্থাৎ বক্তব্য বিনিময়ের সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক, যিনি এতটুকু সময় বা সম্মান দিতে নারাজ, তিনি ভাল ডাক্তার হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন না। লম্বা ডিগ্রি দেখে কারও যোগ্যতা বিচার করা যায় না। তাঁর ব্যবহার, আচরণ, সমবেদনা, সহানুভুতি এবং রোগীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গী ডিগ্রির বহরে ফুটে ওঠে না। রোগেই যদি ইন্টারেস্ট বেশি হয়, রোগীতে নয় - তাঁর সমঝোতা হওয়া সহজ হয় না। রোগীর সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা না থাকলে রোগের নিস্পত্তি যেমন হয় না, চিকিৎসার ব্যাকরণও অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একজন "নন-কেয়ারিং" ডাক্তার

একজন "নন-কম্পিটেন্ট" ও বটে। অনেক ডাক্তার হয় ত অবহিত নন যে তাঁদের ধৈর্যের সীমা নেহাতই পরিমিত। রোগীদের প্রয়োজনীয় সময় তাঁরা দিচ্ছেন না। ডাক্তারে র অফিসে candid camera রেখে প্রমান করা গেছে যে রোগীদের বক্তব্য শুনতে গিয়ে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে তাঁদের ইন্টারাপ্ট করছেন। এ অবস্থার ব্যতিক্রম দরকার। কি করতে পারেন তাঁরা?

- কয়েকটা সাজেশনস:

(১) অফিসের সেক্রেটারি বা receptionist কে একটু শ্রদ্ধাশীল ও বিনীত হতে শেখান।

(২) রোগী ঘরে ঢুকলে দাঁড়িয়ে হ্যান্ড-শেক করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। চেয়ার টেনে পাশে বসলে বা কাঁধে হাত রাখলে রোগীর টেনশন কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

জিজ্ঞেস করুন - 'আজ আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারি?'

(৩) নিজের মতন করে রোগীকে কথা বলবার সময় ও সুযোগ দিন - অন্ততঃ পক্ষে তিন-চার মিনিট, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে উৎসাহ দিন - "তারপর কি হল, বা বলতে থাকুন আমি শুনছি", - ইত্যাদি নানা বাক্য ব্যবহার রোগী তাঁর বর্ণনার খেই হারাবেন না হয়ত। যদি বিশদ কিছু জানবার প্রয়োজন হয়, পরে সে বিষয়ে আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে।

(৪) বিশদ জানতে হলে "open ended " প্রশ্ন করা ভালো, - যেমন - কি, কেন, কেমন, কখন কোথায় - ইত্যাদি ছোট ছোট টিপ্পনি উপযুক্ত বর্ণনায় সাহায্য করে।

(৫) রোগীর সঙ্গে eye contact রাখা ভাল - তাতে রোগী রা রিলাক্স বোধ করতে পারেন।

(৬) নিজের সম্বন্ধে বা নানা অভিজ্ঞতার ছোটোখাটো উপাদেয় ঘটনা সংক্ষেপে ব্যক্ত করলে আবহাওয়া সরল হওয়ার সম্ভাবনা।

(৭) রোগীর আপন পরিবারের সংক্ষিপ্ত সংবাদ বলতে উৎসাহ দেওয়া ভাল।

<u>রোগীদের কি করণীয়:</u>

- একজন "স্মার্ট" রোগীর প্রোফাইল :

নিজের রোগ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জন বুদ্ধিমানের কাজ - সে বই পড়ে হোক বা ইন্টারনেট সার্ফ করে। ডাক্তারের কাছে যাবার আগে তৈরি হয়ে যান। ডাক্তারকে কি বলতে চান বাড়িতে তা রিহার্স করে যাওয়া ভাল। প্রয়োজনবোধে পরিবার বা ঘনিষ্ঠ কাউকে নিয়ে যান। আপনার জিজ্ঞাস্য ও উপসর্গগুলো কাগজে লিখে নিন।

(১) আপনার মনের কথা, উপসর্গ ও রোগের ইতিহাস পরিষ্কার করে ব্যক্ত করুন।

অবান্তর আলোচনা করে ডাক্তারের সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন।

(২) ডাক্তারের মনোযোগ না পেলে বিনীত ভাবে দাবী করুন।

(৩) প্রশ্ন করুন, নোট নিন, সাজেসশন দিন। ডাক্তারের কথা ভালোভাবে বোধগম্য না হলে আবার জিজ্ঞেস করুন; উনি যা বললেন, তা রিপিট করুন বা কাগজে লিখে নিন।

(৪) নিজের যুক্তি ও মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন, এবং ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শে পেছপা হবেন না।
(৫) তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রাখ ঢাক ছেড়ে সব সত্যি কথা বলুন, বিশেষ করে লাইফ-স্টাইল সংক্রান্ত নানা বদভ্যাসগুলো লুকিয়ে রাখবেন না।
(৬) পারিবারিক ও কর্মস্থল যুক্ত কোন অশান্তির কথাও স্বেচ্ছায় স্বীকার করুন।
(৭) নিয়মিত ওষুধ পত্র সেবন চালাতে যদি কোন কারণে অসুবিধে হয় ডাক্তারকে জানাতে দ্বিধা করবেন না।
(৮) নিজের চিকিৎসা নিজের হুজুগে চালালে বা তেমন ওষুধ ব্যবহার করলে ডাহা চেপে যাবেন না।

মনে রাখবেন, সুচিকিৎসার ব্যবস্থাপনায় ডাক্তারের সব সত্য জানবার প্রয়োজন আছে। সব রোগের আরোগ্য বা উপশম হয় না, কাজেই ডাক্তারকে অযথা দোষারোপ করা বা হিংস্র পন্থা অবলম্বন করা সংগত নয়। উন্নতি যদি আশানুরূপ না হয় ডাক্তারকে ব্যাখ্যা করতে বলুন - সোজা ভাষায়। চিকিৎসার কোন বিকল্প আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন, বিশেষ করে কোন সার্জিকেল পদ্ধতির প্রশ্ন উঠলে "দ্বিতীয় মত" নেবার কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করুন।

ডাক্তারের অফিস থেকে বেড়িয়ে এসে একবার ভাবুন কেমন বোধ হচ্ছে?

- এই ডাক্তারের কাছে আবার ফিরে আসবেন কি?
- রোগ ও চিকিৎসার ব্যাপারে মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়েছে কি?
- কী সব টেষ্ট কেন হল, বা তার রেজাল্ট জেনে নিয়েছেন ত?
- ডাক্তারের অফিসই বা কেমন ব্যবহার করল?

আপনি ডাক্তারের সময় ও দক্ষতা কিনেছেন উপযুক্ত ফি-র বদলে। তার উপযুক্ত মূল্য আপনার শুধু প্রাপ্য নয়, অধিকারও বটে।

একজন 'ভাল' ডাক্তার খোঁজা সহজ কাজ নয়। সেই রকম কাউকে যদি পেয়েছেন তাঁর নেক নজরে থাকুন। "নামজাদা বড়" ডাক্তার একজন 'সুযোগ্য' ডাক্তার নাও হতে পারেন। যে ডাক্তার দেবতুল্য হয়ে উঁচু বেদীতে বসে থাকতে চান তিনি আপনার জন্যে উপযুক্ত ডাক্তার হবেন না, তাঁকে আপনার প্রয়োজন নেই। মনে রাখবেন, চিকিৎসার মাত্র সিকি ভাগেরও কম যশের ওপর নির্ভর করে। বিদেশে যে কোনো ডাক্তারের ট্রেনিং , অভিজ্ঞতা, প্রাক্টিশ প্যাটার্ন ও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের বর্ণনা সহ বিস্তৃত খবর অতি সহজে ইন্টারনেটের একটা বোতাম টিপে সংগ্রহ করা যায়। আমাদের সে সুযোগ নেই। বন্ধু-বান্ধবদের সুপারিশের ওপরই আমরা সচরাচর নির্ভর করে থাকি। নিজস্ব প্রাইমারি-কেয়ার ফিজিসিওনও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

অবশেষে :

ডাক্তার - রোগীর সম্পর্ক বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা অনেকবার হয়েছে। শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট মনে হয়, যে এই এই দুই পার্টির টিম হিসেবে কাজ করা প্রয়োজন, চিকিৎসা পদ্ধতির সব ক্ষেত্রেই। এই কেয়ার প্ল্যান -এ রোগীদের সদস্য হিসেবে গণ্য করা দরকার। রোগীকে নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিতে সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। শুধু ওষুধ সেবনে কোনো রোগের চিকিৎসা সম্পন্ন করা যায় না। প্রয়োজন, আনুসঙ্গিক পরিস্থিতির সমতা বজায় রাখা। মেডিকেল সার্ভিস কোন সায়েন্স নয়। কিন্তু জটিল এবং অত্যন্ত জটিল সমস্যা। রোগীরা অনবরত টেনশন -এ থাকেন। রোগ সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের অভাব স্বাভাবিক। এমন কি স্মার্ট রোগীদেরও আপন স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতেই হয়, তাঁদের বিশ্বাস করতে হয়। মেডিকেল সার্ভিস বুঝতে হলে তাঁদের ডিটেকটিভ সাজতে হয়। ডাক্তারের আচরণে বলনে ক্লু খুঁজে বেড়াতে হয়। রোগীদের এই শাস্তি ডাক্তররা নাই-বা দিলেন।

রোগীকে সন্তুষ্ট করা একটা কমপ্লিকেটেড আর্ট নয়। শুধু চাই সমবেদনা, সংবেদনশীল দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি, এবং সচেতন বিশ্বাস। এই অমানবিক পৃথিবীতে একটুখানি মানবতার ছোঁয়া। আমরা জানি, আমরা সবাই মনে মনে সেই রোগীই ত বটে।

এই প্রবন্ধ ডাঃ শঙ্কর নন্দীর সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন "ডাক্তারবাবু বলছি" বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

Saheli

Gouri Banerjee

Saheli, Support and Friendship for South Asian Women and Families is an innovative social work agency that works to reduce violence in the homes of a growing number of immigrants from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and other smaller countries. There are over 200,000 South Asian Americans in Massachusetts. They are socially and culturally diverse, speak over 21 different languages, and straddle the socio-economic spectrum from successful entrepreneurs, doctors, professors, and scientists to those who work for minimum wages in retail stores, restaurants, factories, gas stations, and nursing homes and hospitals. Saheli provides free supportive services to all without prejudice. All information about services is maintained in the highest confidentiality.

In 2016 Saheli helped 180 women and their families, and in 2017 Saheli helped 152 women. The story of Ayesha is typical of the women Saheli serves.

All he wanted was a male child and for me to return to Bangladesh so that he could visit once a year. I rebelled against this idea so he kept me locked up in our apartment and took the keys with him. Not knowing anyone, not speaking English and having no skills, I was very isolated and afraid.

After many tears, physical abuse and denial of basic human rights, I was rescued by a social worker sent by the state of Massachusetts to check up on our newborn child. Thereafter the state filed charges of neglect and abandonment against him, and I started a process that included many court visits and meetings with attorneys. I was able to improve my situation little by little over the years. Were it not for the kind support of social workers at Saheli, I could not have survived—they arranged subsidized housing, legal assistance, helped me to file papers for welfare support, gave me and my child rides to court, attorney offices, drove me to many agencies and offices and gave me money when my child support checks did not arrive. I survived on bare minimum money and were it not for the South Asian community's donations, I could not have survived, fed myself and my child, or paid rent.

> "My marriage was arranged for me in Bangladesh to a much older man who had been married and divorced before. As a young bride I had expected love, affection, kindness and guidance when I arrived as an immigrant bride in Boston, but I received none."

I am past my domestic ordeal after three long years. Today, I have received papers to become a permanent resident in the US, my child is almost four years old, and I have a part time job. I am well on my way to

becomingindependent and self-sufficient. I cannot thank the women of Saheli who helped me to get to where I am today with their patience, guidance and kindness.

One of the most valuable services Saheli brings to abused women is legal advocacy. Saheli is excited to bring valuable advice and guidance from distinguished attorneys to South Asian families who are struggling with legal issues. Services include referrals to Attorney Trupti Patel and Associates for immigration and visa assistance, consultations with Attorney Jerry Tutor of the Access to Justice Program at the Saheli offices in Burlington, referrals to low cost attorneys in the Justice Bridge Program, court accompaniment by trained staff members, assistance with evidence, affidavits and statements, and help to prepare for depositions and trials. All free services are made possible by generous grants from the Lenny Zakim Fund, the Harry Dow Memorial Legal Assistance Fund and donations from the South Asian community. We thank the community for their support for these life-changing services to women and children.

Other critical services offered by Saheli include:

- A 24 x 7 helpline in English and Hindi
- A social worker who offers family counseling
- Domestic violence response such as assistance to find shelter and housing, cash for emergencies, transportation assistance, child care and elder care support.
- Women who wish to join the labor force receive employment assistance – career counseling, job application assistance, referrals to South Asian employers.
- Women who want to brush up on skills and develop English language, computer, and financial literacy skills can attend free classes
- Low income women who enroll in college can also receive up to $2,000 to help finance their education.

In 1996 a few Indian immigrant women who were soon to become empty nesters founded Saheli to offer support to domestically abused women. Since then Saheli has grown slowly and thoughtfully into a well-recognized social work agency, offering not just services to respond to domestic, emotional and physical violence, but also to empower women to lead safe and healthy lives. Saheli office is in Burlington, MA from where it serves most of Middlesex County. Services are available five days of the week from 10 to 4 pm. In addition, trained advocates offer services in Suffolk and Plymouth County on the South Shore and in Worcester County.

প্রভুর সঙ্গে মুখোমুখি

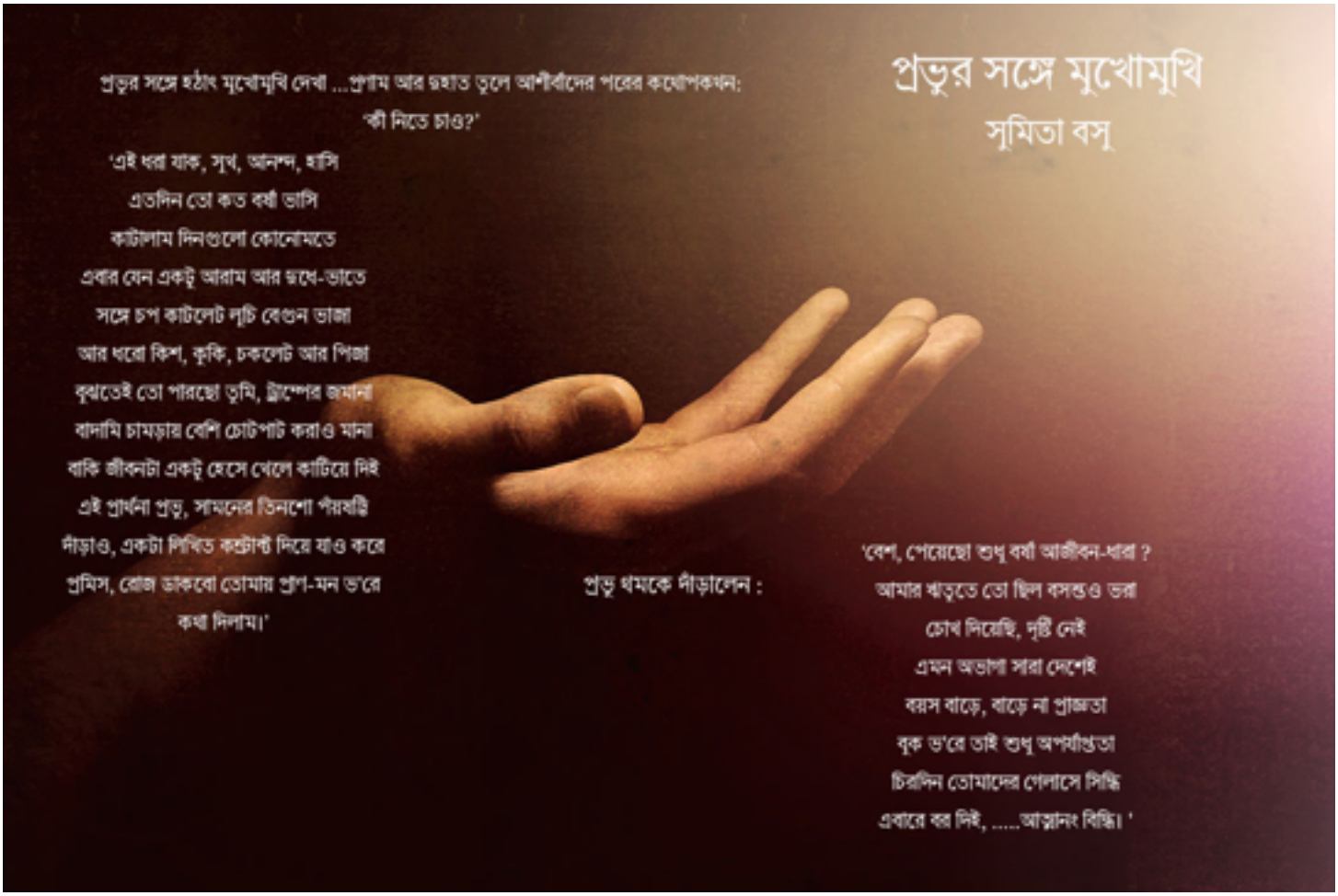

বাণীতীর্থ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্র

গোপা কুমার

বাণীতীর্থের পঁয়তিরিশ বৎসর পূর্ণ হলো । ১৯৮৩ সালে ম্যাসাচুসেটসবাসী কয়েকটি পরিবারের অপরিসীম উৎসাহ ও উদ্দমের স্ফুলিঙ্গ থেকে এই বাণীতীর্থের প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিলো । সেই প্রদীপের আলোয় বাণীতীর্থের ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার তরণী স্রোত ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশে স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা রাখার প্রচেষ্টা সফলতা অর্জন করেছে, পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে বাণীতীর্থ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে । পিতামাতার মাতৃভাষায় ও সংস্কৃতিতে সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য অনেকটাই সাধুবাদ লাভ করেছে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মদের নিকট বিদেশী। 'ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ', তারাও বাণীতীর্থের বিদেশী আঙিনা প্রতি সপ্তাহে তাদের কলকাকলিতে মুখরিত করে। গত তিন দশকে শতাধিক অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে এবং সহায়তায় বাণীতীর্থ সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির দীপমালায় শিক্ষিত প্রজন্মরা আজ গর্বিত। আশা রাখি শৈশবের এই স্মৃতি তাদের নিকট একটি বিশেষ সম্পদ হবে। এই স্মৃতি মন্থনের উজ্জ্বল তারকা বাণীতীর্থের ভাষা বিভাগের শিশুবিভাগ, প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক, প্রাগ্রসর ও কথোপকথন শ্রেণী। শিশু ও কিশোর কিশোরীর কলতানে শ্রেণীগুলি মুখর।

সংস্কৃতি বিভাগের আকাশে বাতাসে আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল, অতুলপ্রসাদ সেন ও বিশ শতকের কত কবির গান শিশু কন্ঠে বেজে উঠে। মঞ্চে প্রবেশ করে বাংলার সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাল্মীকি কবি, আরব্য উপন্যাস, ঠাকুমার ঝুলির নাটক : তাসের দেশ, হযবরল, ক্ষীরের পুতুল, রামায়ণ, আলিবাবা, লালকমল নীলকমল আরোও কতো গল্প। কত রং কত রূপে আমাদের ক্ষুদে অভিনেতারা ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক নিয়ে সেপাই সান্ত্রী, ডাকাত দল, মুনি ঋষি, রাজা রানী, বনদেবীর ভূমিকায় অনায়াসে অংশগ্রহণ করে। ওরা বাংলার গান গায়। ওরা বাংলায় কথা বলে। ওরা বাংলার কবি চেনে। ওরা বাংলায় লেখে পড়ে। বাণীতীর্থ দিবস ঝলমল করে ছাত্রছাত্রীদের নাটকের নানান সাজে, হাসিমুখে এগিয়ে আসে সমাবর্তনে অভিজ্ঞান পত্র নিতে। বাংলা ভাষা শিখে ও সম্মান পেয়ে তারা সেদিন আনন্দিত।

ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ কলরবে মুখরিত হয় সরস্বতী পুজোর দালান। শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিজেদের অনুষ্ঠান । কেউ ফুলের মালা গাঁথে, কেউ বা চন্দন বাটা তৈরী করে, বড়দের সাহায্যে প্রসাদের ফলমূল সাজায়। আরতির কাঁসর ঘন্টা বাজানোর হুড়োহুড়ি পরে যায়। বাংলা খাতা ও বই স্থান পায় মা স্বরস্বতীর পায়ে আশীর্বাদের আশায় । অনাবিল আনন্দে সকলে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে । গান, বাজনা, কবিতা পাঠ ও ছোট নাটিকা করে শোনায় সংস্কৃতির দেবীকে । বাণীতীর্থে সেদিন ছেলেমেয়েদের পাত পেড়ে বসে লুচি, আলুরদম ও পায়েস খাবার পালা । বাণী-

তীর্থ আজকে বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির প্রতি আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মদের আকৃষ্ট করেছে। সুর ভেসে আসছে তাদের কন্ঠে 'আমরা কি বাঙালি হতে পারবো'? আমরা আশীর্বাদ করি ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিবেশে তারা যেন বলতে পারে আমরা বাঙালি - 'আ - মরি বাংলা ভাষা'। মাতৃভাষাকে তারা যেন মর্যাদা দেয়।

আসুন আপনাদের সকলের সহায়তায় বাণীতীর্থের শুভযাত্রা শুরু হোক পরবর্তী অধ্যায়ের।

আজকে সম্বর্ধনা জানাই বাণীতীর্থের জন্মদাতাদের, অভিনন্দন জানাই সেই প্রদীপের বাহকদের যাঁরা এই তিন দশকের উপরে বাণীতীর্থকে শৈশব থেকে কৈশোর ও পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং আহ্বান জানাই পরবর্তী প্রজন্মদের সেই প্রদীপকে প্রজ্জলিত করে বাণীতীর্থ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের পতাকাকে সম্মুখের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

পাখির পালক

ঈপ্সিতা ব্যানার্জি

ফুলকুসমায় এক রাত্রি

প্রভাত কুমার হাজরা

বাঁকুড়া জেলার ফুলকুসমা নামে একটি গ্রাম। ঐখানে যে দশ - বারোটি শাল গাছের জঙ্গল আছে তা আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। অনেক দিন আগে আমাদের প্রপিতামহ দ্বারভাঙার রাজার কাছ থেকে ঐ সম্পত্তি কিনেছিলেন। কিনবার সময় দলিল পত্রে কিছু গোলমাল ছিল। সেই সূত্র ধরে স্থানীয় লোকেরা ঐ সম্পত্তি জবরদখল করে আছে। এখনও মীমাংসা হয়নি। মামলা মোকর্দমা এবং অন্যান্য বিষয়ে তদারক করার জন্যে আমাদের কেউ না কেউ ফুলকুসমাতে উপস্থিত থাকে। আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। ফলাফল এখনও বেরোয়নি। চাকরি খোঁজার জন্যে ছোটাছুটি করছি। তবুও হাতে অনেক সময় থাকে। ঠিক করলাম এবার আমিই ফুলকুসমাতে গিয়ে থাকব কিছুদিন।

হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বে-মেল্ ধরে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম শহরে পৌঁছলাম। তারপর স্থানীয় বাস ধরে ফুলকুসমায় পৌঁছলাম। একটা কুলি ভাড়া করলাম। কুলিকে জিজ্ঞেস করলাম আজ আমি আমি ডাকবাংলোয় থাকতে পারব কিনা। কুলি বলল ---- "এখন ডাকবাংলো খালি আছে। আপনি এখানে নিশ্চয়ই থাকতে পারবেন।" কুলির সঙ্গে ডাকবাংলোতে এলাম। ওখানে ডাকবাংলো দেখাশুনো করার জন্য হরি সিং স্থায়ী ভাবে থাকে। সে বেরিয়ে এসে বলল ---- "বাবু আপনি কেবল আজ রাত্রির মত এখানে থাকতে পারবেন। আগামী কাল সোমবার দুপুরে এখানে সার্কেল অফিসার এসে থাকবে ন।" আমি বললাম--- "কাল ঠিক সকালে আমি ডাকবাংলো ছেড়ে দেব। তারপর আমি একটা বাড়ি ভাড়া করে নেব।" হরি সিং বলল --- "বাবু এটা পাড়াগাঁ। এখানে কি বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়?" একটু পরে হরি সিং বলল --- "তবে এখানে একটা বাড়ি আছে। তবে বাড়িটার কিছু দুর্নাম আছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম --- "কী দুর্নাম?" হরি সিং বলল --- "বাড়ির মালিক একজন মহিলা। ওর স্বামী ছিল। কিন্তু অনেকদিন থেকে তাকে দেখা যায়না।" আমি বললাম --- "তাতে কিছু আসে যায়না। আমি ওই বাড়িই ভাড়া নেব। মালিককে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল।" হরি সিং "আচ্ছা" বলে চলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম আমি ঐ বাড়ি ভাড়া করি তা হরি সিং মোটেই চায় না। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, কাল সোমবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় উঠব ঠিক করলাম। সেই মত অ্যালার্ম ঘড়ি সেট করে শুয়ে পড়লাম সে রাতের মত।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকাল হয়ে গেছে। দেখলাম আমার বিছানার পাশে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরিধানে পাড়হীন সাদা থান। শরীরে গহনার কোনও চিহ্ন নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কেমন যেন অস্বাবিক লাগল। মহিলা খেস-খেসে গলায় আমাকে বলল --- "বাবু আমার বাড়িতে ভাড়া থাকবে? সে তো খুব ভালো কথা। আমি তোমাকে যত্ন করে রাখব । যা ভাড়া দেবে আমি তাই

নেব। বাড়ি ভাড়া করার আগে আমার বাড়িটা একবার দেখে নাও।" কাল দুপুরের আগে ডাকবাংলো ছেড়ে দিতে হবে। বেশি সময় নেই। আমি বাড়ি ভাড়া করার জন্যে মহিলার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। মহিলার সঙ্গে তার বাড়ির সামনে এসে দেখলাম, দরজার ওপর লেখা আছে "কামিনী"। মহিলা হেসে বলল --- "বাবু আমার নাম কামিনী। ওর নামের নিচে আরও নাম লেখা ছিল। সেগুলো মুছে গেছে। অথবা জোর করে মুছে দেওয়া হয়েছে। কামিনী শাড়ির আঁচল থেকে একটা চাবি বার করে দরজা খুলল। আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম ঘর অন্ধকার। স্যাঁতসেতে মনে হল ঘরেতে অনেকদিন কেউ থাকেনি। তবুও ঘরেতে পরিপাটি করে একটা খাট পাতা আছে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। ছিন্নমস্তা নিজের মস্তিস্ক ছিন্ন করে নিজের রক্তপান করার ছবি টাঙানো রয়েছে। বীভৎস। আমি ভয় পেলাম এই বাড়ি ভাড়া করলে আমাকে কি এই সব ছবির সামনে থাকতে হবে? আমি ভয় পেয়েছি ও লক্ষ্য করল। কিন্তু আমার ভীতি অগ্রাহ্য করে ও ছবিগুলোকে প্রণাম করতে লাগল। আমি আবার লক্ষ্য করলাম যে সব ছবিই দেবী মূর্তির।

আমি খাটের ওপর বসলাম। কামিনী মাটিতে বসল। তারপর নানা কথা বলতে আরম্ভ করল। আমি তার কিছু বুঝি না। আমি বাড়ি ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করলে, ও কথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আমি যা ভাড়া দেব ও তাই নেবে। আমি বললাম --- "আমি দুই চার দিনের পরে বাড়ি ছেড়ে দেব।" কামিনী চমকে উঠে বলল --- "সে কি বাবু?" আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল ---- "বাবু আমার বাড়িতে যে আসে সে কখনও ফিরে যায় না। যখন সময় আসবে তখন বুঝতে পারবে।" কামিনী হঠাৎ বলল ---- "বাবু চান করে নাও। চান না করলে অসুখ করবে যে।" ওর কথাগুলো কেমন যেন হুকুমের মত শোনাল। আমি ওর বাড়ির ভেতরে গেলাম। দেখলাম চানের ঘর নোংরা। তবুও চান করার সরঞ্জাম পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে। সামান্য কাক-স্নান করে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ও খাটের ধারে মাটির উপর বসে আছে। হাতে এক কাপ চা। আমি খাটের উপর বসতেই কামিনী বলল --- "বাবু চা তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।" এবারেও ওর কথা হুকুমের মতো শোনালো। যাই হোক আমি চা খেতে আরম্ভ করলাম। ঠান্ডা চা। একটা বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসছে তা থেকে। বাড়ি ভাড়া করতে এসে আমার এমন অবস্থা হবে তা ভাবতে পারিনি। এতক্ষণ সময় চলে গেছে। বাড়ির ভাড়া তখনও ঠিক হয়নি। ভাড়ার কথা উঠলেই কামিনী বলে যে, আমি যা ভাড়া দেব ও তাই নেবে। এখন ও একটা কথা বলল যা আগে বলেনি। ও বলল --- "বাবু তুমি পুরুষ মানুষ। তোমাকে কি আমি এমনি ছেড়ে দেব?" তারপর বলল --- "বাবু আমি যে ব্রত নিয়েছি।" কি ব্রত নিয়েছে তা আমার জানবার উৎসাহ নেই ও চিৎকার করে বলল --- "বাবু পুরুষ মানুষের মত আর একটা বেইমান জাত আছে কি?"

আমি খুব ক্লান্ত। খাটের ওপর শুয়ে কামিনীর কথা শুনতে লাগলাম। ওর কথা অসংলগ্ন। তবুও বুঝতে পারলাম ও নিজের কথা বলে চলেছে। মাঝে মাঝে থেমে ও বলতে লাগল যে ওর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দুই সপ্তাহ আগে ওর স্বশুর একটা ঝামেলা সৃষ্টি করল। গোত্র ঠিক মিলছে না

অজুহাতে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইল। লোকটা শয়তান। সব শেষে বেশ কিছু টাকা আদায় করে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হল। কামিনী বলে চলল। বিয়ের কিছুদিন পরেই কামিনী ওর স্বামীর আসল পরিচয় পেল। বাড়িতে থাকে না। বাইরে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাভাবে ওর বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে কামিনীকে সংসার চালাতে হত। স্বামী যখন জানতে পারল কোথা থেকে টাকা আসছে তখন ও কামিনীর বাবাকে পেয়ে বসল।

কামিনী বলে চলল --- "বাবু সামনের যে হাসপাতাল দেখতে পাচ্ছ তা তখন তৈরি আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম দেশ থেকে বদিরুদ্দিন নাম এক মুসলমান রাজমিস্ত্রী কাজ আরম্ভ করেছে। ও এক সময় নিজে রাজমিস্ত্রী ছিল। এখন নিজে কাজ করে না। একদল রাজমিস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে নানা জায়গায় কাজ করে ঘুরে বেড়ায়। ওর মেয়ে আমিনা খুব সুন্দরী। ছেলে বয়সে ওর মা মারা গেছে। বাবা কোনও লোককে বিশ্বাস করে না। তাই সব সময় মেয়েকে নিজের কাছে রাখে।"

একদিন কামিনীর স্বামী আমিনাকে দেখে পাগল হয়ে গেল। যেখানে বদিরুদ্দিন আর আমিনা থাকে সেখানে স্বামী ঘুরে বেড়াতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে বদিরুদ্দিন সব বুঝতে পারল। কিন্তু চুপ করে থাকল। লোকটা ছিল যেমন ধূর্ত তেমনি শয়তান। বদিরুদ্দিন কামিনীর স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগল। ক্রমশঃ টাকার অঙ্ক অনেক বেড়ে চলল। আমি বাকশক্তিহীন হয়ে কামিনীর কথা শুনতে লাগলাম। একটা দীর্ঘশ্বাসের পর কামিনী বলল --- "বাবু যেমন বড়শিতে মাছ ধরে খেলায়, বদিরুদ্দিনের হাতে আমার স্বামীর সেই অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। অল্পদিনের মধ্যে বদিরুদ্দিন বুঝতে পারল এ ভাবে টাকা ঠকিয়ে বেশিদিন চলবে না। তাই ঠিক করল অন্য ভাবে বেশ মোটা টাকা আদায় করে পালিয়ে যাবে।"

একদিন কামিনীর স্বামীকে বদিরুদ্দিন বলল যে বেশি টাকা পেলে ওর মেয়ের সঙ্গে কামিনীর স্বামীর বিয়ে দিতে রাজি আছে। স্বামী আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ও মনে করল ও আমিনাকে পেয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা একেবারে মিথ্যা। বদিরুদ্দিন যে পরিমাণে টাকা চাইল তা কামিনীর কাছ থেকে না পেলে কামিনীর স্বামী পাবে কোথায়? কামিনীর কাছ থেকে ওর স্বামী অনেকবার টাকা ছাড়িয়ে নিয়েছে। আবার ভয় দেখিয়েছে টাকা না পেলে ও কামিনীকে খুন করবে। যে খুন করবে বলেছিলো সেই খুন হয়ে গেল। একদিন কামিনীর স্বামী বাড়ি এসেই কামিনীর কাছে টাকা দাবী করল। এত টাকা কামিনীর কাছে ছিল না। তখন ওর স্বামী কামিনীর কাছ থেকে গহনাগুলো ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কামিনী অনেক সহ্য করেছে এতদিন। এখন ও রুখে দাঁড়াল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হল। কামিনী এত মরিয়া যে, ওর স্বামী একটা গহনাও খুলে নিতে পারেনি। আর কোনও উপায় না দেখে ও এক হাতে একটা বড় ছুরি কামিনীর গলায় বসিয়ে অন্য হাতে গহনা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। স্বামীর হাত থেকে ছুরি না কেড়ে নিলে ওর মৃত্যু অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত কামিনী ওর স্বামীর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিতে সক্ষম হলো। ইতিমধ্যে কামিনীর বাঁ হাতের একটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে

পড়ল। সেই সময় কামিনী র স্বামী কাবু হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। ছুরিটা তখন কামিনীর হাতে। কামিনী স্বামীর শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বিনা দ্বিধায় স্বামীর বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। কামিনীর মুখে ওর স্বামীর মৃত্যু বর্ণনায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হল জীবনধারণের অপরিহার্য শক্তিটুকুও আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু শুনতে লাগলাম কামিনী বলে চলেছে ওর ব্রত হচ্ছে পুরুষ মানুষকে একটি একটি করে ধরে নিয়ে এসে খুন করে যাবে। বাড়ির দরজায় যতগুলো নাম লেখা আছে তত বার ওর ব্রত পূর্ণ হয়েছে। গভীর ক্লান্তির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। কামিনী হয়ত ওর শেষ কথাগুলো তখনও বলে চলেছে।

কতক্ষণ এইভাবে বলে গেল জানি না। আমি তখন একটু সুস্থ বোধ করছি। দেখলাম অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছে। তখন কামিনী মাটিতে বসে পূজার আয়োজন করছে। কি পূজা হচ্ছে দেখার কৌতূহল হল। তখন ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তখন ওর চোখ টক টকে লাল। পাটের শাড়ি পরে মালা গাঁথছে। ও আমাকে বলল --- "বাবু এখানে এসে বোসো।" এই কথা বলে ও আমাকে একটা পিঁড়ির ওপর বসবার জন্যে জোর করতে লাগল। --- "বাবু ছেলে মানুষি করো না। লগ্ন চলে যাচ্ছে। আজ আমাদের বিয়ে।" আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলবার জন্যে কামিনী আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ওর শারীরিক শক্তি দেখে বুঝতে পারলাম আমি ওর সঙ্গে পারব না। তখন আমি একটা চাতুরীর আশ্রয় নিলাম। আমি ভাব দেখালাম ও আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। কামিনী খুব খুশি হল। তারপর ও একটু অন্যমনস্ক হতেই আমি খাট থেকে লাফিয়ে মাটির উপর পড়লাম। তারপর দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়লাম। যে দিকে চোখ চায় সেদিকে ছুটে চললাম। কতক্ষণ ছুটেছি জানি না। একটু পরে দেখলাম আমি ডাকবাংলোর সামনে এসে পৌঁছেছি।
ডাকবাংলোর দরজা খোলা ছিল। ঘরে ঢুকে আমি বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তখন আমার অবস্থা এমন যে আমি বেঁচে আছি কিনা সে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তারপর নিজের অজান্তে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানিনা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকাল হয়ে গেছে। দেখলাম আমার বিছানার পাশে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পরিধানে পারহীন সাদা থান। শরীরে গহনার কোনও চিহ্ন নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কেমন যেন অস্বাবিক লাগল। মহিলা খেস খেসে গলায় আমাকে বলল --- "বাবু আমার বাড়িতে ভাড়া থাকবে? সে তো খুব ভালো কথা। আমি তোমাকে যত্ন করে রাখব । যা ভাড়া দেবে আমি তাই নেব। বাড়ি ভাড়া করার আগে আমার বাড়িটা একবার দেখে নাও।" আমি তবুও স্থির হয়ে আছি দেখে মহিলা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। দেখলাম ওর বাঁহাতের একটা আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন। ভীতি ও আশঙ্কা আমার সর্বাঙ্গ গ্রাস করেছে তখন। এতক্ষণ যা কিছু দেখলাম তার কি পুনরাবৃত্তি হবে? আমার শরীর হিম হয়ে গেছে। আমার শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম --- "ও এসেছে। ও আবার এসেছে।" আমার বাকশক্তি থেমে গেল। তার সঙ্গে আমার চেতনা শক্তি

হারিয়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে পেলাম তখন দেখলাম হরি সিং আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ দেখে মনে হল আমার যে এই রকমের কিছু একটা অভিজ্ঞতা হতে পারে তা ও প্রথম থেকেই ভয় করেছিল। আমি সুস্থ হয়েছি দেখে হরি সিং বলল --- "দেখছি অনেকদিন পারে কামিনী ফিরে এসেছে। এখন কিছুদিন উৎপাত করে যাবে। বাবু আপনি এখুনি কলকাতা ফিরে যান। সাবধানে থাকবেন। কামিনীর পাল্লায় একবার পড়লে কেউ ফিরে আসতে পারে না।"
হঠাৎ ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল। দেখলাম তখন সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা বাজে।

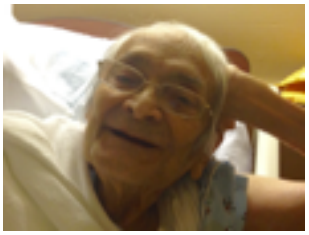

ডঃ প্রভাত হাজরা ষাটের দশকে আসেন আমেরিকাতে, স্নাতক হিসেবে পড়তে। তাঁর বিষয় ছিল Mathematics (Statistics)। ডিগ্রী পাওয়া মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই এক নিদারুণ ও মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়, প্রাণে বেঁচে গেলেও চিরদিনের মতো তিনি প্রতিবন্ধী হয়ে যান। কিছুদিন তিনি পড়িয়েও ছিলেন আর ভালবাসতেন কবিতা ও ছোট গল্প লিখতে। প্রাণস্পন্দনে চির নবীন এই মানুষটি তাঁর শারিরীক সীমিত ক্ষমতাকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে দিয়েছেন মনের ডানা, কল্পনা ও পুরোনো স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে।
তুলে এনেছেন অজস্র মণিমুক্তা যা পাঠককে নিরন্তর করেছে অভিভূত আর বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। বস্টন শহরে 'লেখনী' সাহিত্যসভার সদস্য ছিলেন একসময়। অপূর্ব সেতার বাজাতেন তিনি নিজে, পরবর্তী কালে ভালোবাসতেন ধ্রুপদী সংগীত ও বাদ্য শুনতে।
২০১৮ সালের ১৫ই জুন আমরা তাঁকে হারিয়ে ছি। বয়স হয়েছিল ৮৮, শেষের দিনগুলোতে তিনি বাস করতেন Marlborough, Rehabilititation Center এ। তাঁর মত ঋদ্ধ, বুদ্ধিমান ও প্রাণবন্ত মানুষ দুর্লভ, যিনি প্রতিবন্ধকতাকে হাসি মুখে তাচ্ছিল্য করে, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলতে পারতেন প্রতিদিন, ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, আজ বসন্ত।
অক্ষরাতীত জগতে চলে গিয়েও তিনি অমর হয়ে রইলেন তাঁর গল্পের মাঝে।

জীবনের গতি বিচিত্র

সত্যপ্রিয় সরকার

বস্টনে ফেব্রুয়ারী মাসের কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় হিমকাতর সন্ধ্যা।
মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টসের পার্কিঙের জায়গায় গাড়ি থামিয়ে আমি এবং আজকের সেমিনারে নিমন্ত্রিত বক্তা, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, এই দুজন এলাম মিউজিয়ামের রেস্টুরেন্টে ডিনারের জন্য। প্রসঙ্গত বলে রাখি - এই মিউজিয়ামের ভারতীয় স্থাপত্যের সংগ্রহ স্থাপন করেছিলেন আনন্দ কুমার স্বামী। প্রতিবছর নানা দেশের লোক আসেন তাঁর এই সংগ্রহশালা দেখতে। দোতালায় রেস্টুরেন্টটি ছোট, পরিচ্ছন্ন এবং ছিমছাম। এর বিজ্ঞাপন দেখা যায় না খবরের কাগজে। প্রদর্শনীর শেষে কিছু দর্শক এখানে থামেন।

মেনু কার্ডে দেখলাম এই মাসের শেফ (chef), যিনি পরিবেশিত খাবার নির্বাচন করেন এবং তাঁর নির্দেশে খাবার প্রস্তুতি হয়, তাঁর নাম দময়ন্তী কুমার। অভিজাত হোটেলে নামী শেফের পরিচয় ঘোষণা করা হয় মাঝে মাঝে মেনু কার্ডে। বিখ্যাত শেফের প্রচণ্ড চাহিদা নামকরা হোটেল রেস্টুরেন্ট জগতে। অনেকটা কলকাতায় মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে বিখ্যাত ফুটবলারকে টানার প্রতি -
যোগিতার মত। নাম দেখে মনে হলো শেফ সম্ভবত ভারতীয় এবং হিন্দু মহিলা। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী এলাকার লোক হবেন। খাবারগুলো মোগলাই অথবা নর্থ ইন্ডিয়ান নিশ্চয়ই। কিন্তু মেনু কার্ডের বর্ণনায় দেখলাম সব খাবারই ফরাসী রান্না (French) এবং উত্তর ভারতীয় রন্ধনের সংমিশ্রন। বেশ অভিনব, যেন রবিশঙ্কর, আলী আকবরের সেতার সরোদের সঙ্গে ইহুদী মেনুউহানের পাশ্চাত্য বেহালার মিশ্রনের মতো। খাবারের স্বাদ গন্ধ অপূর্ব, তুলনাবিহীন। রেড ওয়াইনের সঙ্গে খেতে খেতে আমি ও নিমন্ত্রিত অতিথি, দুজনেই স্বীকার করলাম - এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখন হয়নি। বাড়ি ফিরে কম্পিউটার খুলে জানলাম দময়ন্তী টেনেসির রাজধানী শহরের বাসিন্দা। তাঁর স্বামী সুরেশ কুমার ভারতবর্ষে ডাক্তারী পাশ করে দুই দশক আগে ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে টেনেসিতে আসেন। কয়েকটি হাসপাতালে ও প্রাইভেট প্র্যাক্টিসে ব্যাস্ত। দময়ন্তীর এক ছেলে ও এক মেয়ে।
অনুমান করলাম তারা এখন কলেজে পড়ে। দময়ন্তীর বয়স সম্ভবত চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মধ্যে। দময়ন্তী নাম এবং আনুসঙ্গিক বিবৃতি মনে করিয়ে ছিল - কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বুক সেকশন রিভিউতে তাঁর লেখা কুক বুক (রন্ধনের) বই এর উচ্চ প্রশংসা এবং তার সাথে
লেখিকার ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী । এই কাহিনি লেখা হয়েছে তার উপরে আবরণ দিয়ে।

দময়ন্তী ধনী বনেদি বংশের মেয়ে। দেখতে সুশ্রী, যদিও অপরূপ সুন্দরী নয়, লেখাপড়ায় ভালো। বি.এ পড়তে পড়তে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় ধনী রক্ষনশীল পরিবারে ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে। পুরুষশাসিত সমাজে চার দশক আগে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং আত্মনির্ভর স্বাবলম্বী জীবনযাপন ওদের মধ্যে খুবই বিরল।

দময়ন্তী ছোটবেলা থেকে রন্ধনে উৎসাহী এবং পারদর্শী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের, বাঙালী, পাঞ্জাবি, মারাঠি, দক্ষিণ ভারতীয় রান্নার বই সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন রন্ধনপদ্ধতির সংমিশ্রণ করে নুতন পদ সৃষ্টি করতে তার খুবই ভালো লাগে। শিল্পীর ছবি আঁকা, গায়কের সংগীতচর্চা, লেখকের সাহিত্য সাধনার মতো রন্ধনশিল্প এবং মনপ্রাণ দিয়ে তার চর্চা দময়ন্তীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো।

টেনেসির বাড়িতে প্রায়ই পার্টি হয় সুরেশের ভারতীয় এবং আমেরিকান বন্ধুদের। অধিকাংশই ডাক্তার । তারা সকলে নিত্য নূতন রান্নার প্রসংশায় মুখর। প্রতি পার্টিতে কয়েকটি নুতন পদ, ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ান রন্ধনের সংমিশ্রনে তৈরী পরিবেশিত হয়। জন স্টিভেন্স সুরেশ কুমারের সাথে একই হাসপাতালে ডাক্তার। মৃদুভাষী, সুপুরুষ, অবিবাহিত এবং দময়ন্তীর প্রায় সমবয়সী। খেতে ভালোবাসেন এবং অবসর সময়ে আধুনিক সাহিত্য ও কবিতার চর্চা করেন। পার্টিতে চুপচাপ থাকেন। কথা বললে বোঝা যায় মানুষটির মধ্যে গভীরতা আছে। বন্ধুরা উপহাস করে, জনের কখনো বিয়ে হবে না। মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতে হলে যে উদ্যোগের দরকার, সেটা না করে সাহিত্য চর্চা আর রোগী দেখা নিয়ে যে এত ব্যস্ত তাকে কেউ বিয়ে করবে না। জন মৃদু হাসে এবং বলে "বেশ ভালোই আছি ।”

সুরেশের বাড়িতে একদিন পার্টিতে জন দময়ন্তীকে বললো "তুমি একটি রান্নার বই লেখো, তাতে তোমার সমস্ত অভিনব রেসিপি থাকবে। আমার এক বন্ধু নিউ ইয়র্ক টাইমসের বুক রিভিউ বিভাগে আছেন। তাকে বইয়ের একটা কপি পাঠালে ভালো প্রচার হতে পারে।” সবাই খুব উৎসাহ এবং সমর্থন জানালো। এক বছরের মধ্যে দময়ন্তীর বই "A blend of French and Indian Cooking (ফরাসী - ভারতীয় সংমিশ্রণ)” প্রকাশিত হলো। বইটি টাইমসের রিভিউ সেকশনে উচ্চ প্রসংশিত হলো লেখিকার ছবি সহ এবং বেস্ট সেলার তালিকায় এক মাস ধরে প্রথম, যেটা খুবই বিরল।

সুরেশ একদিন দময়ন্তীকে প্রস্তাব দিলো, "ছেলেমেয়েরা কলেজ শেষ করে অন্য শহরে নিজের কাজ ও নিজের জগতে ব্যস্ত। আমি রোগী আর হাসপাতাল নিয়ে দিনরাত বাড়ির বাইরে থাকি। এতো বড় বাড়িতে তুমি একা সময় কাটাও। তুমি একটা রেস্টুরেন্ট খোল। তোমার সময় ভালো কাটবে এবং সংসারের আয় বাড়বে।" পারিবারিক বন্ধু হিসাবে জনের মতামত সুরেশ জানতে চাইলো। জন খুব উৎসাহের সাথে সমর্থন করলো।

শহরের নূতন রেস্টুরেন্ট, নাম সুখাদ্যম - ইন্দো ইউরোপিয়ান ক্যাফে, দিনে দিনে বাড়ে কালকেতুর মতো খ্যাতিলাভ করলো। রিজারভেশন ছাড়া সেখানে যাওয়া যায় না। আসন সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ। বলা বাহুল্য শেফ দময়ন্তী। তার নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকজন নির্বাচিত ভারতীয় পাচক প্রতিদিন মেনু অনুযায়ী ইন্দফরাসি মিশ্রনে পদগুলো প্রস্তুত করে। দময়ন্তী তার এই নুতন সৃষ্টিকে ছোট অথচ অভিনব ভাবেই চালাতে লাগলো। টেনেসির গভর্নর এবং চেম্বার অফ কমার্স বাৎসরিক ডিনার বিসনেস মিটিং এর জন্য এই রেস্টুরেন্ট নির্বাচন করেন এবং এই খবর শহরের সংবাদপত্র এবং টিভিতে ছড়িয়ে পড়ল।

দময়ন্তীর বাইরের জগতে সমস্ত কাজে জন পরামর্শ ও সাহায্য করে। দময়ন্তী জনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ালো। গৃহবধু বিনম্র রন্ধনশিল্পী এবং আমেরিকান সমাজে খ্যাতিমান ও সফল, দময়ন্তীর এই রূপান্তর হলো জনের সৃষ্টি।

সুরেশের বাড়িতে আর আগেকার মতো পার্টি হয় না। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই বাড়তে লাগলো। প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় রাত্রে; কথাবার্তা কম, পাঁচদশ মিনিটের মধ্যে সীমিত। দুজনেই নিজের নিজের জগতে ব্যস্ত। যেন দুটি গ্রহ পরষ্পরের থেকে দূরে নিজের আলাদা কক্ষপথে চলেছে বিচ্ছিন্ন ভাবে।

ডাক্তারীর বাইরে জনের অধিকাংশ সময় যায় দময়ন্তীকে পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য। রেস্টুরেন্ট পরিচালনা ও আর্থিক হিসাবপত্র, বুকটুরে অন্য শহরে যাতায়াত, ইন্টারভিউতে বক্তব্য এবং লেখা, সব কিছুর জন্য দময়ন্তী জনের উপর নির্ভরশীল। জন উপদেষ্টা সহযোগী থেকে এক পথের সহযাত্রী হলো।

দময়ন্তীর খ্যাতি এবং কর্মব্যস্ততা যত বাড়তে লাগলো, সুরেশের মধ্যে এক মানসিক পরিবর্তন রূপ ধারণ করলো। প্রথমে অভিমান, নৈরাশ্য, দময়ন্তীর প্রতি বিরাগ,পরে ক্রোধ এবং তীব্র ঈর্ষা। একদিন রাত্রে সুরেশ দময়ন্তীকে বললো "আমাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। তোমার রেস্টুরেন্ট এবং কাজকর্ম বন্ধ করে দাও এবং সংসারে মন দাও।" দময়ন্তী নীরব। সুরেশ - "আমি প্রচুর আয় করি। তোমার রেস্টুরেন্ট এবং বাইরের কাজে প্রচুর পরিশ্রম। এই সব বন্ধ করে দাও।" দময়ন্তী - "আমি আনন্দের সাথে রেস্টুরেন্ট ও বাইরের কাজকর্ম করি। তাতে আমার পরিশ্রম হয় না।" সুরেশ ক্রুদ্ধ স্বরে বললো - "আমি জানি - তুমি জনের প্রেমে হাবুডুবু। রেস্টুরেন্ট এবং বাইরের কাজ তোমার অবৈধ প্রেম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমার সাথে থাকতে হলে আমার কথা মানতেই হবে।" দময়ন্তী স্তম্ভিত। মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে সে বললো - "তুমি যা চাইছো তাতে আমি যদি রাজি না হই তাহলে?"

সুরেশ - "বিবাহ বিচ্ছেদ; আমার পক্ষ্যে তোমার সাথে থাকা অসম্ভব।" দময়ন্তী নিশ্চুপ। ঘৃণায় এবং রাগে তার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। তারপর বললো - "জনকে নিয়ে তোমার অভিযোগ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমার রেস্টুরেন্ট এবং বাইরের কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে। বিবাহ বিচ্ছেদে আমি কোনো বাধা দেব না।"

কয়েক মাসের মধ্যেই আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ। সুরেশ চলে গেল তার হাসপাতালের কাছে একটি ছোট বাড়িতে কন্ডোমনিয়ামে । সম্প্রতি ভারতীয় মহলে শোনা যায় সে একটি সুন্দরী তরুণী আমেরিকান নার্সের সাথে একসাথে (লিভ টুগেদার) থাকে। দময়ন্তী রইলো বিশাল প্রাসাদের মতো পুরানো বাড়িতে, যেখানে সুরেশের সাথে তার জীবনের গত দশ বছর কেটেছে। এই বাড়িতেই তার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বহু স্মৃতি এই বাড়ির সাথে জড়িত। এখন ছেলে এবং মেয়ে নিজের কর্মজগতে অন্য শহরে ব্যস্ত। তারা মাকে দায়ী করে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য। মেয়ে বছরে মাদার্স ডে (mothers day) তে একটা কার্ড পাঠায়। ছেলের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। দময়ন্তী নিজেকে ব্যস্ত রাখে রেস্টুরেন্ট এবং বাইরের কাজকর্মের মধ্যে । খ্যাতি এবং সাফল্যের মধ্যে একটা মাদকতা

আছে। সমস্যা হয় - সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পার যখন বাড়ি ফেরে রাত্রে। শূন্য বাড়িটা যেন নিরবিচ্ছিন্ন বোঝা। ঘুমের ওষুধ খেয়েও অনেক বিনিদ্র রজনী কাটে। মাঝে মাঝে দেখা যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে এক বিষাদময়ী নারী। ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি ছায়াছবির পর্দার মতো মনের মাঝে ভেসে ওঠে । আত্মসমীক্ষ্যায় সে অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজে - অধিকাংশই নিরুত্তর থেকে যায়। দময়ন্তী মাঝে মাঝে জনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে ডিনারে । অভিনব কয়েকটি পদ রান্না করে। খাবার টেবিলে কিছু কথাবার্তা হয় অধিকাংশই নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে। দময়ন্তী কয়েক ঘন্টার জন্য মুক্তি পায় ক্লান্তিকর অবসাদ ও নৈরাশ্য থেকে।

একদিন রাত তখন দশটা, ডিনার শেষ। টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসে। দময়ন্তী প্রশ্ন করলো "জন, তোমার বিয়ে করা দরকার বয়স তো বাড়ছেই, কমছে না। এই বিষয়ে কিছু ভেবেছো?" জন একটু আশ্চর্য হলো। কিছুক্ষন নীরব । তারপর স্বগতোক্তির মতো মৃদুস্বরে বললো "বিয়ের কথা বিশেষ করে কখনো ভাবিনি। যদি করি, একজনকেই করবো। তা না হলে কাউকেই করবো না।" দময়ন্তী রুদ্ধশ্বাস। মৃদু স্বরে বললো "সে কে?" জন কিছুক্ষন নীরব। তারপর অল্প হেসে বললো “এটা কি বলে দিতে হবে? অনুমান করে নাও।" এরপর দুজনেই নীরব। মোমবাতির মৃদু আলো - তার ছায়া তিরতির করে কাঁপে দেয়ালে। আর শোনা যায় দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। দুজন নিঃসঙ্গ "মানুষের অনুভূতিগুলো শব্দহীন তরঙ্গে ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দময়ন্তী বললো - এই প্রসঙ্গ এখন থাক।" জন মৃদুস্বরে বললো - "রাত অনেক হলো। কাল সকাল ছয়টায় হাসপাতালে আমার ডিউটি। গুড নাইট।” একদিন রাতে যখন কিছুতেই ঘুম আসে না, দময়ন্তী বিছানায় উঠে বসলো। জানালায় তাকিয়ে দেখলো - কৃষ্ণপক্ষের রাতে আকাশে দুই একটি তারা। রাস্তার আলো এবং তার ছায়া পড়েছে বাড়ির চারপাশে। বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, তারা যেন অবাস্তব। বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে নিজেকে দেখলো আয়নায় খুঁটিয়ে। তার মুখে বয়েসের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। দুই নারী দাঁড়িয়ে আছে, একজন দময়ন্তী, অন্য তার প্রতিচ্ছবি। আয়নার ছবির সাথে সে মনে মনে অনেক কথা বললো। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুললো।

রাত দুটোয় জনের শোবার ঘরে ফোনে বেজে উঠলো। জন প্রথমে ভাবলো - এটা নিশ্চয় হাসপাতালের জরুরী কল। অতি পরিচিত নারীকণ্ঠ মৃদুস্বরে বললো "জন, আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী। তুমি তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করো। গুড নাইট।" জন প্রথমে আশ্চর্য হয়ে ভাবলো - কথাগুলো সত্যি শুনছে কিনা। এটা কি একটা কাল্পনিক বিভ্রম। কলার আইডি মিলিয়ে দেখলো - এটা সত্যিই দময়ন্তীর ফোন। এক মাসের মধ্যে দময়ন্তী এবং জনের বিয়ে হলো। সিভিল ম্যারেজ, জনের কয়েকজন বিশেষ বন্ধু এবং সহকর্মী নিমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠান শেষে মধ্যবয়স্ক ইন্দোমার্কিনী নবদম্পতিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানিয়ে তারা বিদায় জানালো। শুরু হলো দময়ন্তীর প্রবাসী জীবনের নুতন এক অধ্যায়। কয়েক মাসের মধ্যে জনের উৎসাহে দময়ন্তী দুটো নুতন কুক বুক লেখা শেষ হলো। সেগুলো শীঘ্রই বেরোবে। একদিন মেইলবকসে দময়ন্তী পেলো - একটি মোটা খাম, বস্টন মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস ছাপমারা এবং তার নাম লেখা। চিঠির বক্তব্য: মিউজিয়ামের

পরিচালক বোর্ড দময়ন্তীকে chef of the month পদে নির্বাচিত করেছে। এটি একটি সম্মানিত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ। আমেরিকার এবং ইউরোপ বিখ্যাত শেফদের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা হয়। এর পারিশ্রমিক (honorium) ৭৫ হাজার ডলার। বোর্ড আশা করেন যে দময়ন্তী এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। চুক্তিপত্রে সই করে ১০ দিনের মধ্যে তার সম্মতি জানাবেন। এক মাসের জন্য পরিচিত শহর, তার রেস্টুরেন্ট এবং কাজকর্ম ছেড়ে এক হাজার মাইল দূরে বস্টনে এক মাস থাকা, সব মিলিয়ে দময়ন্তীর প্রথমে একটু দ্বিধা ছিলো। জন তাকে বললো - "এই রকম সুযোগ খুব কমই আসে। এটা তার রন্ধন প্রতিভার বিশেষ স্বীকৃতি"। শেষ পর্যন্ত দময়ন্তী বস্টনে এল। তার রান্নার সাথে এখানে আমার প্রথম পরিচয়।

এই কাহিনির সমাপ্তি এখানে হতে পারতো। কিছু মানুষের জীবনের গতি অতি বিচিত্র। কয়েকদিন আগে রবিবার সকালে চায়ের কাপ এবং খবরের কাগজ (Boston Globe) নিয়ে বসেছিলাম।

স্থানীয় সংবাদের পাতায় চোখে পড়লো মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টসের ছোট একটি বিজ্ঞপ্তি। বক্তব্য: আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দময়ন্তী কুমারের মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছি। তিনি আমাদের chef of the month পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । তাঁর অসাধারণ রন্ধন প্রতিভা এবং অমায়িক ব্যবহার আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মৃত্যুর কারণ ক্যান্সার (Breast Cancer) বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে রন্ধন শিল্পে এই প্রতিভাময়ী মহিলার অবদান অসামান্য। টেনেসিতে নিজ বাড়িতে সজ্ঞানে তাঁর মৃত্যু হয়। আমরা তাঁর স্বামী ডাঃ জন স্টিভেন্স, পুত্র নারায়ণ কুমার এবং কন্যা প্রিয়ংকা কুমারকে সমবেদনা জানাচ্ছি"। খবরটা পড়ে কিছুক্ষন চুপ করে রইলাম। গৃহিণীর কথায় নীরবতা ভাঙলো। "একি চা না খেয়ে বসে আছো এখনো? চা তো জুড়িয়ে ঠান্ডা হলো"।

বস্টনে হেমন্তের বিষন্ন বিকাল। কাজ থেকে বাড়ি ফিরছি গাড়ী চালিয়ে। চোখে পড়লো মিউজিয়ামের সাদা রংয়ের বিশাল প্রাসাদের বাড়ি। অপরাহ্নের রোদ তার গায়ে একটা হলদে আভা মেলে দিয়েছে। দময়ন্তীর কথা মনে পড়লো। ভাবলাম কি বিচিত্র তার প্রবাসী জীবন। সে যা চেয়েছিল, তার সবটাই কি পেয়েছিল? আর যা পেয়েছিল, তার সবটাই কি চেয়েছিল?

(একটি সত্য ঘটনার ভিত্তিতে এই কাহিনি লেখা। চরিত্রগুলোর নাম ও ঠিকানা পরিবর্তিত।)

সংশয়

প্রান্তিক রায়

তোমাকে বিষয় করে কোনো গল্প নয়
কোমল গান্ধার এক হিমালয় ইতিহাস
সুরে ছন্দে লিখে যাবো পুঁজির পাতায়
এই ছিল মনের আশয়।
সুন্দর একখানি প্রিয়তম মুখ
সুডোল বাহুর ডোরে নিটোল চিবুক
দিগন্তে পেখম তোলা নরম নয়ন
নিথর অধর জুড়ে মদির কাঞ্চন
শরতের শতদলে কেমন কবরীর ছাঁদ
কিশলয় অবয়বে মধু সুরভির স্বাদ
সব কিছুর সমন্বয় এক অনন্য হৃদয়
ভালোবেসেছিনু যারে-
সে এক পরম বিস্ময়
আমায় উদ্বেল করেছিল, তায়
সোহাগের সোনা কথা
রেখে যাব সোনালী লেখায়
এই ছিল মনের আশয়।

এক দিন জেগে দেখি তুমি আর নেই
বালিশেতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে সে-ই
একটি নীরব ছায়া জোনাকি আলোয়
ভীরু মনে চুপিসারে শুধু হাতছানি দেয়
তোমার মেহেদী তনু আর মোহভরা নয়
আনমনা হওয়া যায় তন্ময় নয়
বহ্নি আছে শিখা আছে জ্বালা আর নেই
আজ বুঝি তুমি কৃত্রিম
তুমি শুধু মনের সংশয়
তোমাকে বিষয় করে আর কিছু নয়
আমার সায়রে নেই তোমার আশ্রয়।
তোমার দেহিলি শুধু ভুলের অন্বয়।

Flesh

Author

SUNIL GANGOPADHYAY

Original Title

MANGSHO

It's a heartrending story of a mother, trying to give her family a chance to survive. But will there be a significant price to pay?

The children were sad. In the morning it looked like it was going to rain again. They would have liked the clouds to have been willed away, but those clouds collected in layers on top of the banyan tree near the village funeral pyre.

The name of the village was Chhoto Saturi. In this village a thatched house, made up of two tiny rooms, and a minuscule courtyard belonged to Bibhupada Garai. The three children stood in this courtyard and chanted for a drier day.

Rain, rain, go away

Come again another day....

The clouds heard the children's pleas and wanted to grant their wishes. But, having put up a grand show thus far, they were reluctant to depart elsewhere without fanfare.

First, it was a sultry day. Then the winds began to churn. The big branches of trees started to lash in the wind. It seemed that the noisy distant thunder wanted to say, 'I'm coming, I'm coming.' Soon thereafter, large drops of water began to fall. The drops turned to sheets of water falling from the sky. But, within ten minutes, everything was over. The sky was clear, and there was a cheerful sunshine peeping through the curtain of clouds. This brief monsoon shower reminded one, how fickle-minded human beings are! Only two months ago there was much prayer for rain and now the chant was for its end.

For the time being the clouds receded at the request of the children. But the roads were full of mud, and with additional rain, the muddy roads would be impossible to ply. The children's patience was being sorely tested.

Bibhupada was waiting outside in the courtyard along with the children. Surobala was running late. Bibhupada called out once, "Any further delay . . . we do want to reach on time, while there's still daylight....."

Their seven-year-old daughter shouted, “Ma. Come Ma. Please c- o-m-e.”

The girl’s brothers, one nine year old and the other five, were also waiting anxiously in the tiny front yard. The youngest, who had his head shaved for a severe case of lice infestation, was equally restless.

Surobala came out of the larger room carrying a small bundle of clothes in her hand. She calmly closed the door and put a padlock to secure it. Surobala was a woman of about thirty years. She had a lean, tall physique. Her face was unusually inert, devoid of any expression—be that of joy or that of intrigue at a lover’s tryst. She handed the keys to Bibhupada and simply said, “Ok. Let’s go.”

Bibhupada, who earlier was rushing his wife, now keys in hand, became contemplative. He said, “Are you sure you want to do this, Suro?”

Surobala replied firmly, “Yes, I’ve decided I’ll go.” “And the children?” asked Bibhupada. “Yes, let them come too.”
All three children clamored in unison, expressing their eagerness to join their parents. There were no neighbors close to Bibhupada’s house. The house was on the outer periphery of the village where a few scattered tenements had established themselves.

Straight ahead, the road led to the burning ghat. The children were afraid to take this road even during broad daylight. Human bones and other remains had been occasionally found nearby. Those who could not afford wood to cremate the bodies of their loved ones completely, performed partial cremation. The vultures and the foxes would do the rest. Today the children were being accompanied by their parents, so no need to be afraid.

The whole family together had never been on an outing before. Sure, the boys had been to the market with their Father occasionally, but the girl and the Mother had always stayed back home.

A Sadhu had established himself under the banyan tree with his trident. There, the family came to a standstill. Surobala bowed respectfully with bended knees. The sadhu raised his fingers and chanted some blessings. However, Surobala didn’t have any money to give the sadhu as an offering. When she returned from visiting the sadhu, her daughter asked with great curiosity, “Ma, why do sadhus smear ash all over their bodies?” Surobala turned over the question to Bibhupada saying that men should answer these types of queries.

“All the sadhus in the world are the disciples of Lord Shiva,” explained Bibhupada. “And Lord Shiva has decreed that all his disciples smear ash on their bodies for easy identification. No ash means no sadhu.”

“Baba, what’s the significance of snakes wrapped around the neck of a sadhu?”asked Chhotu, Bibhupada’s youngest son. Impatience was evident in Bibhupada’s voice, “The

snakes have always been there from the very beginning of time. Well, enough questions already. Now, let's hurry up."

The children ran forward, leaving their parents at a considerable distance. They had to be called to slow down. Soon they approached Rathtala, an area inhabited by people inhabited by people with means. Festivals like Durga Puja and Dol were held there. On one side of the road, a few van-rickshaws were available for hire. The drivers of some of these van-rickshaws were relaxing nearby, waiting for passengers, as they sipped hot tea from small glass tumblers.

From this spot, the Garai family had quite a distance to travel to reach their destination. They could possibly walk, but it would be late by the time they return. Besides, they were supposed to arrive at a specific time in the afternoon.

Bibhupada approached humbly one of the drivers he knew from before. "Hello Govindoda, how're you doing? Are you about to leave?"

Bibhupada could ill-afford a ride to the destination for all five people. He had sought out Govindo about a possible cheaper ride in his van-rickshaw. Govindo had to deliver ten large earthenware pots of jaggery from the Sanatanpur market. If passengers could not be found on the way, he had agreed to give Bibhupada and his family a ride for a part of the journey.

Govindo said, "I see there are no passengers and yet I've to leave. But listen, I can't give a free ride to all of you. Won't it be a hard labor to pull so much load?"

Bibhupada felt deflated. Upon seeing his predicament, Govindo said, "At least pay me half of what is just. Five rupees per head."

"OK, but what about the youngest one?" Bibhu tried to negotiate.

"Give me fifteen rupees in total," said Govindo and extended his hand for the cash.

I'll pay you in installments with the Goddess Kali as my witness." Bibhu said with great embarrassment.

In a condescending manner Govindo replied that in his line of work he had seen much. His current policy was not to lend anybody any money. "In these trying times, I do not believe even promises made in the name of the Goddess. Now, get on**."**

The children, who were till now listening with wide-eyed curiosity, excitedly rushed upon the van-rickshaw. Susheel being the eldest, had the first right to select a seat. He checked the front and the side to see which was most convenient. Sudha and Chhotu were not allowed to sit dangling their feet. They sat inside on the floor, cross-legged. Susheel at least had previously seen and ridden van-rickshaws. He had jumped in and out of these vehicles while they were still moving. But for the youngsters, this was their lucky break to travel to a distant region. They were particularly intrigued, how the road

disappeared even before they walked on it. How they overtook people on foot with such an amazing speed!

For all three children this was their first trip outside the village. Villages here all looked the same; however, for them there was no end to their feeling of amusement.

“Look, look, how one plant is growing on the surface of another plant. Wow, two plants together!”

“What are those large birds? See, those are being chased by the dog.”

“They’re called vultures.”
“Do vultures ever come down to the ground?”
“Where’s that man taking the two bamboo sticks on his shoulders?”

“Ha! To his home, of course.” “Why’s the temple broken?”
“It broke, that’s why it’s broken. Enough, now be quiet.” Bibhu interrupted in an irritated voice.
The youngest one had the most questions and correspondingly the most number of reprimands from his parents. But it was hard for him to stay quiet for too long.

After a while Govindo asked Bibhu¸ “So, where are you going with your family, Bibhu?”We’re going to Rongkalipur where my in-laws live.”

“I see, I see. You’ll have a good time, and your wife will too. Besides, the kids will get to enjoy their grandparents, uncles and aunts.”

Bibhu’s tone of voice reflected the fact that Govindo’s social standing was higher than his. Sudha had packed some muri from home. The children started eating it. Susheel whispered to Suro, “Ma, is it true, we’re going to our uncle’s house? How long will we stay?” Suro looked at Bibhu’s face. Bibhu avoided discussing the issue. Instead he said, “The vehicle is moving and tossing too much. Make sure you don’t spill your muri.”

“Baba, do you want to eat some?” asked Sudha. “Nah, you all finish it.”

Meanwhile, Chhotu started his question session again, “Who can fly higher, a kite or a vulture?”

“Why is that girl crying? Look, look...” “Is buffalo father of cow?”
The children were in a joyful mood throughout the journey, but the parents were mirthless. Bibhu interjected suddenly and yelled out, “Stop. Stop your questions. Enough.”

The road was narrow and full of potholes. On top of that, a truck was now in front of the van-rickshaw, thus cutting off its ability to go forward. Govindo got off and started to yell. The big truck, with its equally matching hefty driver, was competing with the tiny van-rickshaw. The children got involved in this battle, cheering the underdog van-rickshaw all the way. Finally, the truck moved off the main road into the muddy embankment of

the paddy fields, and made a quick dash to the other side of the road. This was a victory for Govindo, so all three children cheered and congratulated him on this joy ride.

Surobala came close to Bibhu's ear and whispered, "Will you be able to cook dinner for the children?"

"Yeah, I'll cook rice for them; that shouldn't be so difficult." "Now potatoes are in season. Also, Sudha can lend her hands. Just don't ask her to light the fire in the clay oven."

"Don't worry about that. I'm also going to send the eldest to school." Sudha suddenly asked, "Ma, what's in your travel bundle?" Suro replied, "Two sarees."
Chhotu, who had been quiet for a while due to his Father's reprimands earlier, lost his self-control and blurted out, "Ma, how many uncles do I have in my grandma's house?"

Susheel responded quickly before Bibhu lost his patience with Chhotu, "You'll find out once you go there, stupid!"

None of these children had been to their grandparent's house before. And none had experienced the excitement and joy that it would bring to the young children.

Sanatanpur market loomed in the distance. Govindo stopped his van- rickshaw to let the family out. "You said you were going to Rongkalipur, so better get off here. The road is just on your left. It's not very far." He then reminded Bibhu about his promise of payment once again.

The road to Rongkalipur was better. Not too many potholes. The Keleghai river ran along the side of the road. Water lilies covered large portions of the open water. The main residential area of the town was laid back some distance away. Next to the river, on one side, there was an eight to ten room building made of corrugated tin. Nearby, there were two stores selling miscellaneous goods. A few men were sitting in the front and doing nothing in particular.

Some distance away, the children stopped in their tracks. Bibhu took his wife's hands and said gently, "Wait, are you sure you want to do this?" Suro's expressionless face revealed no emotion whatsoever. She said, "Yes, I told them I will be coming."

"Even now you can get out of your commitment, I hope you know."

"No, I've decided to give it a try."
"I didn't force you to do this, I hope you know."
"Of course, you didn't force me. I decided to do this on my own !"

The children were becoming restless. They could see plenty of buildings with people in them. But which would be the ones had their uncles and aunts?

"Let's go, Baba," pleaded Susheel.

Bibhu cleared his throat, “Children, listen, only your Mother is going this time. She’ll go all by herself. We’ll return home without her today.” Then he looked at Surobala and said, “The day’s almost over. Perhaps you should make a move too.”

All three children had the same question on their lips: “Why? Why can’t we go too?”

Bibhu replied, “It’s not a place for kids like you. Your Mother will return soon, I promise. Till then, can’t you just stay with me?”

This response did not sit well with Sudha. Perhaps female instinct develops more rapidly than male. She looked straight at her Father.

Bibhu answered gently, “There is a person in this facility who is very sick, no visitors are permitted.” He then looked at Suro and said, “Please get going, it’ll be dusk soon.”

Chhotu wrapped both his little arms around Surobala’s thighs and would not let go. He put his face among the many folds of her saree and entreated, “Ma, I’ll not shout or disturb anybody. Please, please take me with you.”

Suro looked at her husband and then at her other two children. Then, slowly disentangling Chhotu from herself she said, “I’ll take you later Chhotu. Go home with Baba today. And behave yourself at home.”

She said to Sudha, “Hold your brother. Take care of him.” Surobala then bowed to touch her husband’s feet. She hugged all three children once more. Then, without a single word, she rapidly walked away towards the houses. Midway, she looked back and paused. The she said, “Please don’t go just yet... please wait here just a little longer.”

A group of men were chatting. As she walked by, one of them pointed out the place she should go to. A large room with a prominent threshold, reaching it necessitated the use of the alley. It was full of mud. Moreover, the rooms that were lined up in this alley were filled with women of various ages. They all peered from the windows. At the end of the alley, the road trifurcated into three directions. Before Suro could decide the correct path for herself, one of the girls shouted, “On your right, my dear. Can’t you see, the Madam of Rongkalipur, the fierce Goddess incarnate?”

In a large open quadrangle, a very large-sized woman was holding court. Next to her lay a container of paan. A wispy thin woman, Shefali, was attending her.

The wispy woman asked, “Madam aunty, isn’t this the one who is supposed to come in today?”

With her mouth full of paan juice, Madam tried to welcome Suro while simultaneously giving her the once-over. “Please come my dear, please sit down my darling.” Her voice softened considerably when she asked in a sympathetic voice, “Victim of misfortune

Married or widow?” She quickly realized her mistake when she saw the sindoor on

Suro's forehead. "So, did he run away and desert you?" "No, he stays at home."
"Understood. He's incapable of earning enough money to feed the family. How many mouths to feed?"
"I've three children."
Madam was shocked, "What! Three!"
She again visually examined her from top to toe, "Any daughter? How old is your daughter?"
"Six or seven."
Madam let out a long sigh. Then she said, "Ah...how unfortunate!

It'll be a long time before your daughter will be ready to get married. Till then, you're responsible. We give shelter to our children in our wombs, and in due time, they're ready to drain us. Give me this, give me that, never ends. When they're old enough to be self-sufficient, they grow wings to fly the coop. I also had two sons. Do they know anything about my whereabouts?"

The wispy woman joined forces by declaring that her son also exhibited similar tendencies.

"So, did your husband force you to come here?" Madam continued.

"No, I came on my own." Suro nodded.

"Of course you have, my dear. Have to survive by whatever means possible. Nobody will shed a tear if you die like that. As for the lout of a husband of yours, if he comes anywhere near here, kick him away. My men too will severely mess him up."

"My husband suffers from a severe lung disease."

"Yeah yeah, I know enough! I've heard it all. You don't have to give me the details of his disease. What's in that bundle?"

Madam briefly looked at the sarees before vetoing them on the spot. "At a minimum, when working here, you need a saree with brocade border. There is a store here, can you buy today?" Suro didn't have the money needed to buy anything. She remained quiet.

Madam did not get irritated. "That's perfectly all right, dear. You can take a few of my old sarees till yours are ready. The food service here's your individual responsibility. I've no part to play in that. Shefali will explain in detail to you later. I can't give you a room tonight. You've to stay with Mokshada. Mokshada is suffering from dropsy, so she can't tolerate any food. Because of that, she has become humorless, irritable, and shows a terrible temper. She has shown this temper even to some of the customers! Oh, no no, that's absolutely prohibited. I know this, because a few of them have complained to me. Customers are our prized possessions. You've to feed them, care for them, and take care of all their needs. Get it?" She paused briefly. "Don't worry, I'll get rid of her within a few days, and then that room will be all yours. In the meantime, keep your mouth shut

no matter what she says. I'll take care of all problems that may arise. Now, go with Shefali, and she'll show you the room."

But Suro did not budge. She continued sitting there, staring at Madam.

"What happened? Get up. Go. It's almost time. Customers will be coming in any minute now."

Suro, with her head bent low, now stared at the ground and said, "Can you lend me two hundred rupees?"

Madam's countenance changed dramatically. Her freckled face looked like slow-burning coals. She said in a stern voice, "Lend money? What money? I didn't entreat you to come here— you came of your own volition. Hey, listen, here you earn the money first, then you spend it. You haven't earned a single rupee yet; how can you possibly look for an advance? Shit!"

Suro still had her head bent low. Hesitantly she repeated, "But I need the money now, I really need it."

"Hmm...who doesn't need money? Tell me, who? The whole world needs an unlimited source of money. Since I've not started a charitable organization, if you don't like it here, you're most welcome to leave. I'm not going to force anybody to stay against their wishes. I'm in a business."

"The children are waiting outside. If I don't put something in their hands, they won't have anything to eat tomorrow morning." Suro said in a trembling voice.

Madam was about to give her another round of tongue-lashing when she suddenly stopped. Her eyes registered astonishment, "What did you say? Did you say that the children are waiting outside? You... brought them with you? Are you nuts! Have you no sense of parental responsibility? The customers here are great sinners; they live in the city with other evil thugs, goons and monsters. These monsters would even devour seven-year- old girls. Children should be kept as far away as possible from these elements. Don't you know!"

As she advised Suro against the evil men of the world, she took the help of Shefali to get out of the bed and waddled into the adjoining room, where several wardrobes held all of Madam's possessions.

Suro sat still.

She came on her own, that might be true, her husband did not force her to come here. But Bibhu's cough was getting worse. And the prescribed medication wasn't being effectivHis energy level was in constant decline. Consequently, at times he was unable to do even the household chores. Potential jobs that pay fair wages were continually

drying up. He had no experience laying bricks and mortar. How could he feed the children, staying at home without a job, day after day?

Suro also tried to earn a living. She tried frying muri, washing dishes in people's homes, cleaning rooms. For these, she had to go to the neighborhood of well-to-do people for a full-time job. She had to stay at their homes, play a nanny to the sons and daughters of the wealthy, or even just be a maid. But these positions were fraught with difficulties.

The pay was meager—she would get food for herself, and a measly salary. This would not even be sufficient. She and her husband could survive with half-full belly, but how could she tolerate the cries from the pangs of hunger of her three young children? They were brought into this world, it was not their fault !

At night, after the children had gone to sleep, Bibhu and Suro would discuss their future and find no ray of hope. All their utensils, and household goods of any value, had been already sold off. There was nothing more to sell. Only, Suro's flesh was left. The abject poverty and hard work had not entirely robbed Suro of her physical beauty yet. As a doting mother of three, couldn't she do something more for her children? This question kept daunting her over and over again.

Collecting loose changes from various places, Madam had managed to put together about hundred rupees. She handed this money over to Suro along with a cheap dark brocade saree. "Go, give this to your children. This is the first time I'm lending money in advance to someone. These 'Shyamolis' of the world will confirm you, I'm not a lender by any means. Give the money, then change your saree and get to work, pronto."

Suro came out and saw Bibhu standing under a tree holding Sudha. The two boys were standing in front of the general store, greedily watching all the types of snacks displayed nicely that one could buSuro handed the money to Bibhu. Gently she said, "Buy lots of rice. The new crop is very good for rice congee. Not only delicious, but filling as well. Also, potato and ginger are in season now. Pretty cheap. At least for today, let the children eat well."

Sudha asked, "Ma, can't we see the inside just once? We won't say a word. Promise."

"Not today. Perhaps another day," replied Bibhu, "Mother will be coming back for sure. It won't be long." "Yes, I'll be back." Chhotu burst into tears.
"Let's get the kids some candy," suggested Suro. Immediately

Susheel ran to the store. The other children followed.

Face to face with each other, Bibhu and Suro were at a loss for words. Her face was devoid of all emotions. She whispered in his ears, "Be careful and wash your mouth with salt water if it starts bleeding again," she said with a pause, being practical as usual. "Take care of yourself. Will you?"

In contrast, Bibhu was all choked up. He did not know what to say under these circumstances. He cleared his throat and wiped his eyes. By the time he had regained his composure, Suro had already moved away.

With one candy in the hand and another in the mouth, the three children were ecstatic. They moved forward executing rhythmic dance steps, first on one foot, and then on the other— as only innocent children of the world can perform.

Translated by: **Haimanti Dorai**

Haimanti Dorai, a beloved member of the Bengali community in Boston for many years, passed away on March 1, 2018. Haimanti received her M.Sc. in Biology from the University of Bombay (now Mumbai) and her Ph.D. in Genetics from the University of Minnesota. After post-doctoral training in Harvard University, Cambridge, Massachusetts, she worked for over twenty years in the Biotech and Pharmaceutical Industry in the USA. She published her research findings in several scientific journals. We hope our readers will enjoy this story translated by Haimanti.

This story was originally published in the book, "Treasures from Bengal: An anthology of Selected Bengali Short Stories". We want to thank Bengali Literature Goes Global (BLGG) and Indic House (IH) for allowing us to reprint this story, ' Mangsho' in our Puja magazine. We also want to thank Mr. Souvik Gangopadhyay and Smt. Swati Gangopadhyay for their permission to translate the original Bengali story 'Mangsho' for publication in the above referenced book.

আমার পুরোনো ট্রাঙ্ক

সত্যপ্রিয় সরকার

ঘরের কোনে মেঝেয় পড়ে আছে একটি ট্রাঙ্ক।
সাতাশ বছর আগে এই ট্রাঙ্ক নিয়ে
পড়তে গিয়েছিলাম আমেরিকায়।
দশ বছর পরে এটি নিয়ে ফিরেছি দেশে।
ট্রাঙ্ক খুলতেই ন্যাপথলিনের গন্ধের সাথে
বেরিয়ে এলো বদ্ধ বাতাস।
ভিতরে এলোমেলো ছড়ানো কলেজ জীবনের
ডিগ্রির সার্টিফিকেট ও মার্কশীট।
মায়ের চিঠিগুলো একটি সাদা ফিতেয় বাঁধা।
শেষ চিঠিটা খোলা,
তার লাইনগুলো বারবার পড়া প্রায় মুখস্ত।
"তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে,
যদি পারো অল্প সময়ের জন্য একবার এসো।"
ক্যাম্পাসের কিছু ছবি পড়ে আছে।
একটি গ্রুপ ফটো বন্ধুদের সাথে তোলা আমার ফেয়ারওয়েলে।
আমেরিকান অধ্যাপকদের লেখা কয়েকটি সার্টিফিকেট
তাতে রয়েছে আমার অসংখ্য গুনের বর্ননা
যাতে দেশে একটা চাকরি জোটে।
তোমার চিঠিগুলো গুছিয়ে রেখেছি
তারিখ অনুযায়ী সোনালী ফিতেয় বাঁধা।
একটি গার্ডেনিয়া ফুল রেখেছিলাম পাশে,
কয়েকটি শুকনো সাদা পাপড়ি খসে পড়েছে
কিছুদিন পরে তোমার চিঠির সংখ্যা কমতে লাগলো।
মনে হয় যেন দায় সারাভাবে লেখা,
একদিন চিঠি আসা বন্ধ হলো।
তবু আশা নিয়ে শূন্য মেলবক্সটা খুলতাম প্রতিদিন।
আষাঢ়ের মেঘের মতো বিষাদের ঘন ছায়া ছড়িয়ে পড়তো মনে।
সময়ের প্রলেপে সবই সয়ে যায়।
দেশে এসে জানলাম - কয়েক বছর আগে

অক্সফোর্ডের ডিগ্রী পেয়ে তুমি কানাডায় গিয়েছো
ইমিগ্রেশন নিয়ে, সেখানে তুমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা।
যোগাযোগ হয়তো করা যেত,
কিন্তু যে হারিয়ে যেতে চায়, কি হবে তাকে খুঁজে।
একটা পার্কার পেন পড়ে আছে ট্রাঙ্কের কোনায়,
তুমি দিয়েছিলে চিঠি লেখার জন্য।
পাশে রয়েছে একটি ছোট কৌটো, রেশমচিকন চুলের একটি গুচ্ছ
কাঁচি দিয়ে কেটে কৌটোয় ভরে আমাকে বলেছিলে,
"এটা দেখলে তোমার মনে হবে আমি কাছেই আছি।"
একটি খামের ভিতরে যত্নে রাখা তোমার ফটো অনেক দিন পরে দেখলাম।
ঘন কোঁকড়া চুল মাঝে সরু সিঁথি।
উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কমনীয় মুখ, আয়ত মায়াবী চোখ।
বয়স তেইশ ছোঁয়া তুমি দাঁড়িয়ে আছো নয়ন সমুখে।
মনের পিয়ানো বাজতে শুরু করলো টুং টাং শব্দে,
হৃদয়ের আবেগে বয়ে যায় এলোমেলো বাতাস।
ভাবছি তোমায় এখন দেখতে কেমন?
হয়তো একটু পাতলা হওয়া ববকরা চুলে কিছু রুপালি রেখা,
হয়তো পশ্চিমী পোশাকে চেহারায় সাফল্য ও ডলারের প্রাচুর্যের ছাপ।
একটি চড়ুই পাখি উড়ে এসে জানালায় বসলো,
তার কিচিরমিচির শব্দে ফিরে এলাম বর্তমানে।
গৃহিণীর পদশব্দ শোনা গেলো।
"একি ট্রাঙ্কের সামনে চুপচাপ বসে আছো?
ওতে আছে কতগুলো পুরোনো ও যত রাজ্যের আবর্জনা।
ওটাকে ফেলে দিলে ঘরটা ভালো দেখায়।"
সকালের সোনালী রোদে ছিমছাম ঘরটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
এর মাঝে পুরোনো বিবর্ণ ট্রাঙ্কটি মোটেই মানায় না।
ধুলো মুছে ট্রাঙ্কটি সযত্নে বন্ধ করলাম।
বললাম "এটি থাকবে এই ঘরে।"
এর মধ্যে আছে পুরাতন আমি।
রয়েছে আমার ফেলে আসা দিনগুলোর
মধুর বিষাদবিধুর স্মৃতি,
যা দিয়ে মনের গোপন গভীরে গেঁথেছি একটি বিনি সুতোর মালা।

সুখ পাখি

সেলিনা আহমেদ

সুখ পাখিটা কোথায় আমার
খুঁজে কোথায় তাকে পাই ?
মনে হচ্ছে ধারে পাশে -
কিন্তু নাগাল না তার পাই।

সুখ পাখিটা
ভোরের শিশির গাছের পাতায়
যেন লাল গোলাপের ভীড় ;
সবুজ গাছে, হলুদ ফুলে -
পাখি বাঁধে নীড়।

সুখ পাখিটা নীল আকাশে
মেঘের কোলে দোলে;
ভালোবাসার কিছু কথা
শোনায় খেলার ছলে।

সুখ পাখিটা ঝড়ের দিনে -
বৃষ্টিভেজা প্রাতে;
ছড়ায় মোরে সুখের আবির
নদীর কলস্রোতে।

সুখ পাখিটা কাছে আসে
জ্যোৎস্নামাখা রাতে;
ক্লান্ত বুকে আমার সুখে
হাতখানা তার রাখে।

সুখ পাখিটা - আঙ্গিনাতে মাদুর পেতে
যেন মায়ের কথা ভাবায়;
সুখ পাখিটা ভোরের ফোটা
রঙ্গীন লাল জবায়।

সুখ পাখিটা দূর আলাপনী টেক্সট মেসেজ
ভালোবাসার বাণী;
ছেলে, মেয়ে আর ভাই, বোনের ভালোবাসা
যেন মিঠে পানি।

সুখ পাখিটা কিচির, মিচির
পাখির ডাকের গান;
এক ঝলকে এক পলকে
জুড়িয়ে দেয় যে প্রান।

সুখ পাখিটা
জীবন যুদ্ধের চাবি কাঠি;
সুস্থ মন প্রাণ
যেন সারা জীবন গাইতে পারে
ভালোবাসার গান।

অণু কবিতা

বদিউজ্জামান নাসিম

ভ্যালেন্টাইন
দিয়েছিলে ভালোবাসা অহোরাত্র
আমি ছিলেম নিমিত্ত মাত্র!

সেতার
সে তার গল্প বলে তারে
সেতারের তারে তারে।

করাত
কাটে দিন, কাটে রাত
কাটে যৌবন কালের করাত।

Ma Durga in Shreya's Eye
Shreya Bose Age 16

Welcome Ma Durga
Radha Basu Age 5

A New Dawn

Vedashree Acharyya *Age 8*

Zinnia

Radha Basu Age 5

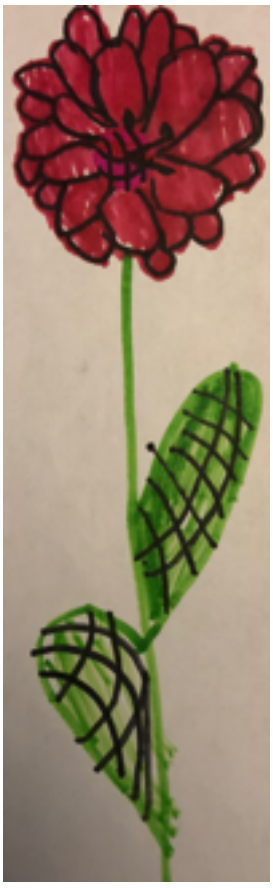

Blanked Out

Bihan Dasgupta Age 13

I try to process

What happened.

Barely flashing back

To the times

Of slight satisfaction-But can't

reach too far.

Over thinking,

I tell myself.

And suddenly blank out,

Back to the land

Of shallow thoughts.

The Bird Who Wanted a Friend

Vedashree Acharyya Age 8

Once upon a time there was a young bird named Tweet. He was sitting in a cage by the open window. The warmth of the sun felt good against his feathers. He felt very calm, happy and relaxed. He felt the cool breeze. It was a perfect day and he wondered if the day could get any better. Just then, Tweet heard a noise, It was the wild animal's laughter. They were outside playing with their friends. They played many games including Birdy idol (Tweets favorite) and were having so much fun! Tweet felt very lonely and wanted to play with them but he couldn't get out of his cage. Just then, Tweets owner came to feed him. Tweet asked him if he could play outside with the other birds. All the owner heard were chirps and tweets so he did not understand anything. Tweet tried again and again but the owner still didn't understand. Tweet started to get annoyed. Tweet planned to escape the house when the owner was asleep. That night he found a hole in his cage and jumped out. Then, he crept very quietly through the open window in the room. His great adventure had begun.

After a while of flying, Tweet came to a tree. On the tree was a hazy figure. Tweet looked closer and realized it was the evil owl. Tweet was disappointed. He thought he would be able to be friends with the owl but Tweet didn't want to be friends with someone evil, so he quickly went somewhere else. Soon, Tweet came to a pond so he decided to get a quick drink. When he came closer he changed his mind, for in that water there lived a scary frog. The frog was eating flies and Tweet thought he was next. He quickly ran away and went somewhere else. Then Tweet came to a desert but just as he was getting down to do some sun bathing he saw a cobra. "He is going to eat me!" Tweet thought. The cobra saw Tweet and started slithering towards him. "Yummiesssssss," he whispered. Tweet was very scared so he quickly started to go home.

Finally, Tweet reached home. It was night time and he was exhausted. Everything seemed so different. He quietly tiptoed back to his cage and fell into a deep sleep dreaming about his adventures. He even snored…zzzzzzzzzzzzzzzzzzz!

The next day there was a great surprise for Tweet, the owner had brought a new friend. Tweet was so happy. The owner said to name him. Tweet thought for a while, and then said "Flaps". Flaps said, "I like it" and they became friends. They played many games including Birdy Idol (Tweets and Flaps favorite). Tweet was so glad to have a friend and they lived happily ever after……till their next adventure… ☺

Moral: "Grass is not always greener on the other side" Patience is a virtue……..

Back to School

Umasrija Sarkar Age 9

Back to school, Hooray! Hooray!

So excited on that very day!

Meeting some old friends or
making new ones,

Of course, there is nothing as
much fun!

Studies, sure!…Math, this-that…

I will still find some time to chat!

Playing and more, all day long,

Dancing in dance club and learning a new song.

Back to school, Hooray! Hooray!

Here I come 3rd grade, I am on my way!!

Ma Kali

Sourya Narayan Chaudhuri Age 6

In Memoriam

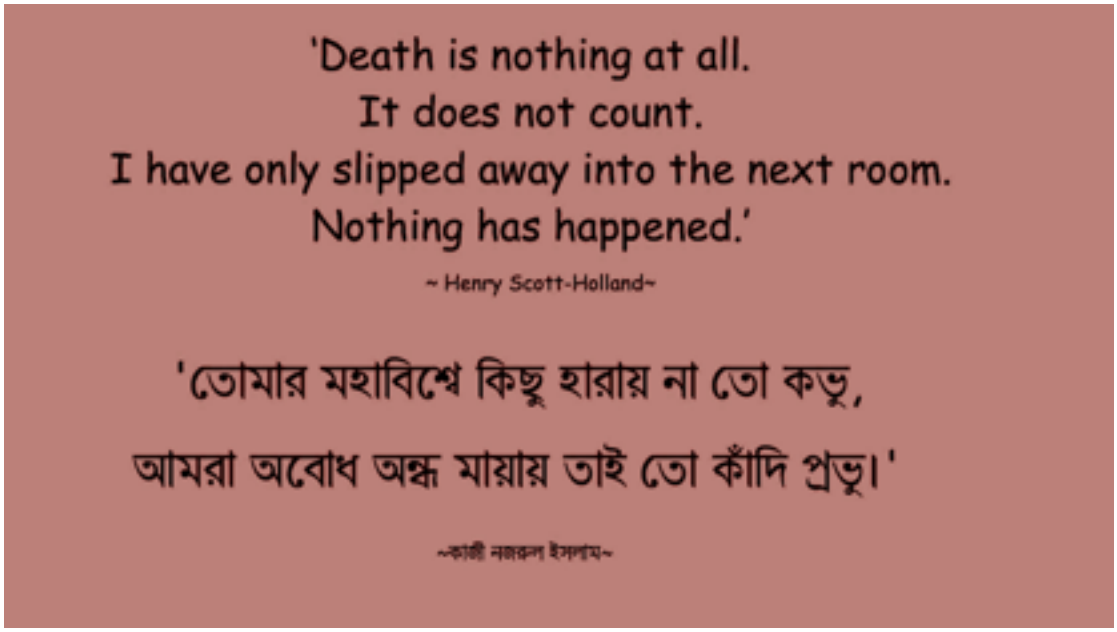

In loving memory of

Haimanti Dora

Prabhat Hazra

Tridip Mukherjee

Jayanta Banerjee

Renu Mukerjee

Animesh Sarker